যিনি আমাকে হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছেন, যিনি আমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন, যাঁহার আশীর্ব্বাদ কর্ম্ম-জীবনে আমার একমাত্র সম্বল, সেই দেবতা পিতার চরণ স্পর্শে আমার এ সাধের **বঙ্গবালা** পবিত্র হউক !
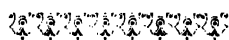
বঙ্গবালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরেশনাথ মধুপুরে আসিয়াছেন, ব্যাধি নিরাময় করিতে নহে,—কারণ তাঁহার দেহে ব্যাধির কোন লক্ষণই ছিল না। তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর দেহটির দিকে চাহিলে ব্যাধি বলিয়া যে কোন জিনিষ তাঁহার দেহের ভিতর কোনও দিন প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, এমন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি মধুপুরে আসিয়াছিলেন বেড়াইতে, কেবলমাত্র দেহটাকে একটু চেক্‌নাই করিতে। মধুপুরে আসিবার তাঁহার নিজের যে বিশেষ কোন একটা ইচ্ছা ছিল তাহা নহে, তাঁহার পিতা—শম্ভুনাথবাবু একরূপ জোর করিয়াই তাঁহাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন।

একমাত্র পুত্রের পিতার যদি অর্থের অপ্রতুল না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টিটা একটু বিশেষ ভাবেই তাঁহার পুত্রের দেহের উপর যাইয়া পতিত হয়। পুত্রের শারীরিক অবস্থা যেমনই হউক, তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হয়, এই বুঝি পুত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িল,—এই

বুঝি পুত্র ব্যাধিগ্রস্থ হয়। শম্ভুনাথবাবুরও পরেশনাথ ছাড়া আর কোন সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার অবস্থাটাও কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শম্ভুনাথবাবুর অর্থের কোন দিনই অপ্রতুল ছিল না। তাঁহার পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাই যথেষ্ট, ইহা ব্যতীত তিনি আবার চাউলের কারবারে বিস্তর টাকা আয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার চাউলের আড়তে প্রায় চার পাঁচ লক্ষ টাকা খাটিতেছিল। তিনি টাকাটাকে যে পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহার হিসাবে খরচ তাঁহার মোটেই বৃদ্ধি হয় নাই। তাঁহার সংসারে তিনটি প্রাণী,—তিনি নিজে, তাঁহার পত্নী শ্যামা-সুন্দরী ও পুত্র পরেশনাথ। তাঁহার আয় ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সে হিসাবে ব্যয় ছিল না বলিলেই হয়; কাজেই টাকাটা ফাঁপিয়া ফুলিয়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল।

পরেশনাথ শম্ভুনাথবাবুর নয়নের মণি ছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি ধনিদিগের পুত্রের ন্যায় আদুরে নাড়ুগোপালটি হইয়া দাঁড়ান নাই। তাঁহার বয়স এক্ষণে ত্রয়োবিংশের ঊর্দ্ধ নহে; ওষ্ঠের উপর গোঁপের কালো চিহ্ন সবেমাত্র রেখা টানিয়াছে। তাঁহার দেহটি দেখিতে যেমন সুন্দর ছিল, ভিতরে তেমনি গুণের অন্ত ছিল না। তিনি বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। একমাত্র পুত্রের পিতার প্রাণটা পুত্রের ভাবনায় সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হইয়া থাকে। শম্ভুনাথবাবুরও পুত্রের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার ব্যাধি ব্যাধি

একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি প্রতি বৎসরই একবার করিয়া জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পুত্রকে কোন না কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রেরণ করিতেন। এই জল বায়ু পরিবর্ত্তনের অছিলায় পরেশনাথের প্রায় অনেক স্থানেই ভ্রমণ করা হইয়াছে, বাকি ছিল মধুপুর। এইবার তাই তিনি মধুপুরে আসিয়াছেন।

আজ প্রায় এক মাসের অধিক হইল পরেশনাথ মধুপুরে বাসা করিয়াছেন। মধুপুরে আসিয়া তাঁহার সহিত অনেক অপরিচিত নূতন লোকের আলাপ হইয়াছে। বিদেশে সকলেই বিদেশী। সকলেই জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছেন। এখানে কাহারও আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব নাই; সকলেই সকলের অপরিচিত। কাজেই এখানে পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে সকলেই ব্যগ্র। এখানে দুই চারি দিনের জন্য কেবল মেলামেশা; কাজেই পরস্পর পরস্পরের কোন স্বার্থ নাই। সকলেই যেন সকলকে কোলে টানিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদাই হস্ত বাড়াইয়া আছে।

মধুপুরে আসিয়া পরেশনাথের অনেকের সহিতই আলাপ হইয়াছিল কিন্তু মহিমবাবুর পরিবারের সহিত যেমনটি হইয়াছিল এমনটি আর অপর কাহার সহিত হয় নাই। মহিমবাবুর মত এমন সরল প্রাণ, সদালাপী ভদ্রলোক পরেশনাথ পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। তাঁহার সহিত প্রথম আলাপেই তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার উপর একটা অসীম ভক্তিতে পরেশনাথের সমস্ত হৃদয়টা

একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মহিমবাবু নিজে যেমন তাঁহার পত্নী আনন্দময়ীও সেইরূপ। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে জননী-স্নেহ যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে ভক্তিতে মাথাটা তাঁহার পদতলে আপনি লুটাইয়া পড়ে। মহিমবাবুর সহিত আলাপ হইবার পর হইতে প্রত্যহই বৈকালে পরেশনাথ একবার করিয়া মহিমবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন ও বহুক্ষণ তথায় গল্প গুজব করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। প্রত্যহ যাতায়াতে মহিমবাবুর পরিবারের সহিত পরেশনাথের বেশ একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছিল।

মহিমবাবু সখ করিয়া বেড়াইবার জন্য মধুপুরে আসেন নাই। সখ করিবার তাঁহার অবস্থা নহে। তিনি মহা দায়গ্রস্থ হইয়াই মধুপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প বেতনে কলিকাতায় এক সওদাগরী আফিসে কার্য্য করেন। জামাতার কঠিন ব্যাধির জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মধুপুরে আসিতে হইয়াছে। বহু কষ্টে বড় সাহেবের নিকট অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া কেবল মাত্র দুই মাসের ছুটি পাইয়া তিনি জামাতাকে লইয়া সপরিবারে মধুপুরে আসিয়াছেন। তাঁহার পরিবারে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি লোক। তিনি নিজে, পত্নী ও তিনটি কন্যা। মহিম বাবুর পুত্র ছিল না, তাই তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া অনেক ব্যয় করিয়া, কেবল সুপাত্র দেখিয়াই জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। পাত্রের নিকট-আত্মীয় বড় একটা কেহ ছিল না,

তিনি ভাবিয়াছিলেন জামাতাকে ঘরে রাখিয়া পুত্রের অভাব পুরণ করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ, বিধাতার ইচ্ছায় বাধা দেয় মানুষের সাধ্য কি? কন্যার বিবাহের কয়েক মাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই জামাতা এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল। মহিমবাবু আফিসে যাহা মাহিনা পাইতেন তাহাতে কোন ক্রমে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ হইত, সঞ্চয় এক পয়সাও হইত না। এ অবস্থায় জামাতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আয়ের অপেক্ষা ব্যায়ের দিকটা রীতিমত বাড়িয়া গেল। জামাতার চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যে মহিমবাবুর ক্রমেই ঋণ হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু ঋণ প্রত্যহ মিলে না। জামাতা এক বৎসর শয্যাশায়ী,—ঋণ প্রত্যহ দিবে কে? বাধ্য হইয়া মহিমবাবুকে বাড়ীখানি বন্ধক রাখিতে হইল কিন্তু তবুও জামাতার ব্যাধি নিরাময় হইল না। এ পর্য্যন্ত চিকিৎসকগণ ধরিতেই পারিলেন না যে, তাহার কি রোগ হইয়াছে। চিকিৎসায় হতাশ হইয়া শেষ যদি জলবায়ু পরিবর্ত্তনে কোন সুবিধা দর্শে সেই আশায় তিনি জামাতাকে লইয়া মধুপুরে আসিয়াছেন। কিন্তু মধুপুরে আসিয়াও জামাতার রোগের কোনই উপশম হয় নাই, জ্বরের এক দিনের জন্যও বিরাম নাই ;—অবস্থা ভালোর দিকে এক তিলও অগ্রসর হয় নাই, বরং দিন দিন মন্দের দিকেই যাইতেছিল।

কয়েক দিন হইতে মহিমবাবুর জামাতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ। আজ বৈকালে পরেশনাথ যখন মহিমবাবুর বাড়ী হইতে

ফিরিয়াছেন তখন তাঁহার জামাতার অবস্থা তিনি যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বুকটা একেবারে দমিয়া গিয়াছে। জামাতার যেরূপ অবস্থা তাহাতে রাত্রি কাটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। মহিমবাবুর সহিত পরেশনাথের অতি অল্প দিন মাত্র মধুপুরে আসিয়া আলাপ হইয়াছে। তাঁহার জামাতার সহিত পরেশনাথের কোন সম্পর্কই নাই, কিন্তু তথাপি মহিমবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি পরেশনাথের প্রাণের সমস্ত সুখ যেন একেবারে প্রাণের ভিতর বসিয়া গিয়াছিল। মানুষের প্রাণের রহস্য যে কি তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। আজ যেন জগতের সমস্ত বিষণ্ণতা পরেশনাথের প্রাণের ভিতর জড় হইয়া একটা মহা বিদ্রোহের সূচনা করিতেছিল। কিন্তু এ বিদ্রোহ যে কিসের পরেশনাথ শত চেষ্টা করিয়াও প্রাণের নিকট হইতে তাহার কোনও কৈফিয়ৎ বাহির করিতে পারিতেছিলেন না।

রাত্রে পরেশনাথ আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু কিছুই মুখে রুচিল না। বিষণ্ণতা কণ্ঠের ঠিক নিম্নেই এমনি একটা বিরাট যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিয়াছিল যে, আহার কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল না। তিনি নাম মাত্র আহার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বসিয়া থাকিতেও তাঁহার আর ভাল লাগিল না, একবারে শয়ন গৃহে যাইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন নিদ্রার সাহায্যে প্রাণের বেদনাটা চাপা দিবেন কিন্তু

নিদ্রা বাদ সাধিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল বিছানায় পড়িয়া শত সাধনাতেও সর্ব্ব-চিন্তাহারিনী মহা-আরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর দর্শন পরেশনাথের ভাগ্যে ঘটিল না। তিনি যেন তাহাকে চিরদিনের মতন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া পরেশনাথের একেবারে শয্যা-কন্টক হইয়া উঠিল। আর বিছানায় এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকা অসম্ভব। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা হৃদয়ে লইয়া তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। শয্যার পার্শ্বেই একটা গবাক্ষ ছিল, তিনি একটুখানি অগ্রসর হইয়া যেই জানালাটা খুলিয়া দিলেন। রজনীর কালো অন্ধকার চোরের ন্যায় ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। পরেশনাথ গবাক্ষ দিয়া একবার মাত্র বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাহিরে কৃষ্ণ পক্ষের স্তব্ধ অন্ধকার ঝিঁ-ঝিঁর স্বরে মথিত হইয়া উঠিতেছে। আকাশে চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, সমস্ত আকাশটা আজ একেবারে কালো মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সেই স্তব্ধ অন্ধকারকে চকিত করিয়া চপলা মাঝে মাঝে চম্‌কইয়া উঠিয়া যেন সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতর একটা বিভীষিকার নৃত্য দেখাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দূরে,—বহুদূরে আকাশের কোলে গুর্‌গুর্‌ শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে। সেই ঘোর বিভীষিকাময়ী রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া পরেশ-নাথের প্রাণের ভিতরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। চকিতে যে কথাটা তাঁহার মনের ভিতর উকি দিল, তাহা ভাবিতেও

তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তিনি তাড়াতাড়ি গবাক্ষটা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার শয্যার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু সহসা নিম্ন হইতে একটা ভীত অস্পষ্ট স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি আবার চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। নিম্নে কে যেন কথা কহিল, স্বরটা যেন পরিচিত, তিনি কাণটা বেশ একটু সজাগ করিয়া ধরিলেন। কর্ণে যে স্বর প্রবেশ করিল তাহা তাঁহার পরিচিত, সে স্বর ভয়ে যতই বিকৃত হউক—যতই অস্পষ্ট হউক, সে স্বরতো তাঁহার ভুল হইবার নয়, সে স্বর যে মহিমবাবুর কনিষ্ঠা কন্যার। পরেশনাথের বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে নামিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। গৃহের সম্মুখেই বারান্দা, তিনি বারান্দায় বাহির হইয়া নিম্নে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর নীচে কে কথা কইছে?"

ঠাকুর কলিকাতা হইতে পরেশনাথের সঙ্গে আসিয়াছে, সে বহুদিন হইতেই তাঁহাদের বাড়ীতে রন্ধন কার্য্য করিতেছে। ছোটবাবুর স্বর পাইবামাত্র সে উত্তর দিল, "আজ্ঞে মহিমবাবুর ছোট মেয়ে আপনাকে খুঁজ্‌চেন।"

পরেশনাথের সমস্ত প্রাণটা একেবারে মহা চঞ্চল হইয়া উঠিল, যেন কি একটা আশঙ্কায় তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইবার মত হইল,

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিনি জোর করিয়া তাড়াতাড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই,—কোথায় সে?"

ঠাকুরের উত্তর আসিল, "ওই যে ওপরে যাচ্ছেন।"

পরেশনাথ মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া সিঁড়ির দিকে চাহিলেন। ভীত চকিত পাংশুবর্ণ মুখে মহিমবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। স্বর্ণের সহিত তাহাদের বাড়ীর একজন ভৃত্য লণ্ঠন লইয়া আসিয়াছিল, সেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিয়া আসিল। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো বালিকার মুখের উপর পতিত হইল। পরেশ নাথ দেখিলেন, ভয়ে বালিকার মুখখানি একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। সে মুখখানিতে যেন আর এক বিন্দুও রক্ত নাই। যে সরল সুন্দর মুখখানির উপর নির্ম্মল হাসি শরতের জ্যোৎস্নার মত দিনরাত্রি ফুটিয়া থাকিত, তাহা আজ একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে। বিষাদ মনের সাধে তথায় আপন রাজ্য পাতিয়া বসিয়াছে। পরেশনাথ সে মুখের প্রতি অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, কম্পিত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্ণ, এত রাত্রে কি দরকার! তোমার জামাইবাবু ভালো আছেন তো?"

স্বর্ণ এখনও বালিকা। তাহার বয়স এক্ষণে সবে মাত্র বার পরিপূর্ণ হইয়াছে। কৈশোর এখনও তাহার সমস্ত দেহটি বেষ্টন করিয়া নূতন তরঙ্গ তুলিতে পারে নাই,—সবে মাত্র হেলিয়া দুলিয়া

তরঙ্গ তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার ঢলঢল মুখখানির টুক্‌টুকে রং টুকু যেন বিধাতার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির এক নূতন বৈচিত্র সাধন করিয়াছে। তাহার উন্মুক্ত রুক্ষ কেশরাশি আলুথালু ভাবে উড়িয়া আসিয়া মুখ চোখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। স্বর্ণ মুখ হইতে সেইগুলি সরাইয়া দিয়া,—কষ্টে ভীত কম্পিত স্বরে উত্তর দিল, "পরেশবাবু শিগ্‌গির চলুন, বাবা আপনাকে ডাক্‌ছেন। জামাইবাবু কেমন কচ্ছেন। তিনি আর বোধ হয় বাঁচবেন না।"

বালিকার সেই ভীতিপূর্ণ করুণস্বরে পরেশনাথের কর্ণের ভিতর একসঙ্গে শত করতালির ধ্বনি ঝম্‌ঝম্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণের ভিতরটায় যে কি যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, তাহা বুঝিলেন কেবল তাঁহার অন্তঃরাত্মায় যিনি সর্ব্বদাই বিরাজ করিতে-ছেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিবার মত হইল; তিনি তাড়াতাড়ি নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া স্বর্ণের হাত দুইখানি পরম যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভয় কি স্বর্ণ! ওকথা কি বল্‌তে আছে। কে বল্লে তোমার জামাইবাবু বাঁচ্‌বেন না। ব্যমো হয়েছে ভালো হয়ে যাবেন, ভয় কি?"

স্বর্ণ একবার মাত্র ভীতা হরিণীর ন্যায় পরেশনাথের মুখের দিকে চাহিল। অশ্রুজলে তাহার নয়ন ছল ছল করিতেছিল, সে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "মা কাঁদ্‌ছেন, দিদি কাঁদ্‌ছে, সবাই কাঁদছে। আমার বড় ভয় কচ্ছে, আপনি শিগ্‌গির চলুন।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

বালিকাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেশনাথের সাহসে কুলাইল না। তিনি মহিমবাবুর জামাতার অবস্থা যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলেন রাত্রি কিছুতেই কাটিতে পারে না। মহিমবাবু যখন এই রাত্রে তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন তখন তাঁহার জামাতার যে শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। এই গভীর বিভীষিকাময়ী রাত্রে,—আত্মীয় বান্ধবহীন সুদূর বিদেশে মহিমবাবুর বিপদের কথা স্মরণ করিয়া পরেশনাথের সমস্ত দেহটা শিহরিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি আন্‌লা হইতে একটা পাঞ্জাবী টানিয়া লইয়া, সেটা পরিতে পরিতে বলিলেন, "চল।"

স্বর্ণ আর কোন উত্তর দিল না, অতি চঞ্চল চরণে অগ্রসর হইল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরেশনাথ সবেমাত্র সিঁড়ির দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় সেই বিভীষিকাময়ী নীরব রজনীর সমস্ত নীরবতাকে আলোড়িত করিয়া মহিমবাবুর বাড়ী হইতে এক নিদারুণ করুণ বিলাপ-ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমস্ত আকাশে বাতাসে একটা শোকের কালিমা ছড়াইয়া দিল। পরেশনাথ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইতেছিলেন কিন্তু স্বর্ণ ভয়ে দিশেহারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া একেবারে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। পরেশনাথ চমকিত হইয়া স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন স্বর্ণের সমস্ত দেহটা একেবারে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার

সেই ঢল্‌ঢলে মুখখানি যেন একেবারে শবের মুখের মত হইয়া গিয়াছে, তাহার নয়ন বহিয়া,—গণ্ড বহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কেবল অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

পরেশনাথের বুকটাও ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল, তিনি নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "ছি স্বর্ণ, এ সময় কাঁদ্‌তে আছে ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যমরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাখানা যেন একটা প্রকাণ্ড আতঙ্কের মূর্ত্তি ধরিয়া চারিদিকে বিভীষিকা ছড়াইতে ছিল। গৃহের ভিতর তখন হুলুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছে, যমদূতগণ তাহাদের রাজার আদেশ প্রতিপালন করিয়া বিভৎস্য দামামা বাজাইয়া যাত্রার আয়োজনে হুলুস্থুল বাধাইয়া তুলিয়াছে। পরেশনাথের সমস্ত দেহটা ছম্ ছম্ করিতেছিল, তিনি ধীরে ধীরে বুকে বল বাঁধিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার প্রশান্ত হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি পিতা মাতার একমাত্র স্নেহের সন্তান, চিরদিন সুখের ভিতরেই প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কোন দিন দুঃখ বেদনা স্পর্শ করিতেও পারে নাই। আজ এই নিদারুণ শোকের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণের সমস্ত তার একেবারে বিকল হইয়া গেল। তিনি বিহ্বল দৃষ্টিতে গৃহের চারি দিকে চহিতে লাগিলেন।

তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখস্থ তক্তপোষের উপর পতিত হইল, তাহার উপর মহিমবাবুর জামাতা শায়িত,—তাহার সর্ব্বাঙ্গে একখানা

সাদা চাদর দিয়া ঢাকা। মহিমবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা অৰ্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় আলুথালুভাবে সেই শবের বুকের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। মেজের উপর পড়িয়া তাঁহার পত্নী বুকভাঙ্গা চীৎকার করিতেছেন। গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পরেশনাথের সমস্ত শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার পা দুইটা আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে চাহিতে ছিল না। তিনি চৌকাঠ পার হইয়া দ্বারের সম্মুখে নিস্পন্দ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে সহসা ঘৃত পড়িলে সে যেমন একেবারে পূর্ণ বিক্রমে লক্‌লক্ করিয়া উঠে, পরেশনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া শোকটা আবার একেবারে পূর্ণ বিক্রমে উথলিয়া উঠিল। মহিমবাবুর পত্নী একটা কাতর দৃষ্টিতে পরেশনাথের মুখের দিকে চাহিয়া 'বাবা গো আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো', বলিয়া একটা মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই কাতর দৃষ্টি, সেই মর্ম্মভেদী চীৎকারের সম্মুখে পরেশনাথ নিজেকে সংযত রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত প্রাণটা তোলপাড় করিয়া উঠিল,—নয়ন প্রান্ত অশ্রুজলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল ;—তিনি রুমালে চক্ষু ঢাকিলেন।

গৃহের এক কোনে মহিমবাবু পাষাণ মূৰ্ত্তির ন্যায় দাঁড়ায়াছিলেন। তাঁহার চুল উস্কখুস্ক, নয়নে এক বিন্দুও অশ্রু নাই। ভিতরের সমস্ত অশ্রু যেন চিন্তা রাক্ষসীর নিষ্ঠুর উত্তাপে একেবারে শুখাইয়া কাঠ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়-বান্ধবহীন সুদূর বিদেশ,—জামাতার শেষ কাজ কি করিয়া সম্পন্ন করিবেন; এই চিন্তাটাই তখন নানা বিভীষিকা মূর্ত্তিতে তাঁহার প্রাণের ভিতর একটা মহা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল। এবং তিনি ক্রমেই যেন ঘোর অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া যাইতেছিলেন। সেই সময় সহসা পরেশনাথকে সম্মুখে দেখিয়া যেন একটা ক্ষীণ আশা সহসা তাঁহার প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে পরেশনাথের নিকটে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিলেন। সেই শোকপুরীর ভিতর প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পরেশনাথের সমস্ত প্রাণটা একেবারে একটা মহা শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা মনুষ্য স্পর্শে তাঁহার সমস্ত শরীরটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি তিনি পশ্চাৎ ফিরিলেন। তাহার দৃষ্টি মহিমবাবুর দৃষ্টির সহিত সংমিলিত হইল। কিন্তু কণ্ঠ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না, তিনি বিহ্বলভাবে মহিমবাবুর দিকে চাহিতে লাগিলেন। এতক্ষণে এক ফোটা অশ্রু মহিমবাবুর চোখের কোণে গড়াইয়া আসিয়াছিল, তিনি হস্তের দ্বারা সেইটা সরাইয়া দিয়া, ইঙ্গিতে পরেশনাথকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। পরেশনাথ কথা বলিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু বাক্য মুখ হইতে বাহির হইল না। তাঁহার কণ্ঠতালু শুখাইয়া একেবারে জড়াইয়া গিয়া ছিল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বঙ্গবালা

গৃহের সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র বারান্দা। গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহিমবাবু সেই বারান্দার রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দেহ আর কিছুতেই খাড়া থাকিতে চাহিতে ছিল না, তিনি মহাকষ্টে কোন ক্রমে সেটাকে খাড়া রাখিয়াছিলেন। পরেশনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মহিমবাবুর মুখের দিকে চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না। কিছুক্ষণ নীরবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মস্তক তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। আকাশ কৃষ্ণবর্ণ, কালো মেঘ তথায় আরোও জমাঠ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। বাতাস একেবারে নাই বলিলেই হয়; টিপ টিপ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। পরেশনাথ সেই অন্ধকার রাত্রের সেই ঘোর অন্ধকারময় আকাশের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি আবার দৃষ্টি নত করিলেন।

মহিমবাবু এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া নিজেকে একটু সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু কিছুতেই সামলাইতে পারিতে ছিলেন না। অশ্রুজল নয়নের বাঁধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিল। যদি তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন তবে অন্য সর্ব্বলকে কি করিয়া বোঝাইবেন। যেমন করিয়াই হউক, হৃদয়কে দৃঢ় করিতেই হইবে! মৃত জামাতার সৎকার করা এক্ষণে যে তাঁহার কঠিন কর্ত্তব্য। তিনি একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "পরেশ নাথ"—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরেশনাথ মুখ তুলিয়া চাহিল। মহিমবাবুর শুষ্ক কণ্ঠস্বর, উদাস দৃষ্টি তাহাকে একেবারে বিচলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার মত তাহার কোন কথাই যোগাইল না, কেবল একটা পলকশূন্য দৃষ্টি লইয়া সে মহিমবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহিমবাবুর প্রাণের ভিতর তখন যে ঝটিকা বহিতেছিল, তাহা যদি কোন ক্রমে বাহিরে বাহির হইতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি উন্মত্ত হইয়া যাইতেন, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই কণ্ঠের দরজা বন্ধ থাকায় তাহা ভিতরে তাল পাকাইয়া বাহিরে বাহির হইবার জন্য ক্রমাগত কণ্ঠের দরজায় ধাক্কা দিতেছিল। মহিমবাবু একটু নীরব থাকিয়া একটা ধাক্কার বেগ সামলাইয়া বলিলেন, "যা হবার তা তো হয়েছে। এই বিদেশ-বিভূই এখানে কারুর সঙ্গেতো তেমন চেনা পরিচয় নেই,—এখন এর দাহ করার কি হয় ?"

মহিমবাবুর কথায় দিশেহারা পরেশনাথের প্রাণটা যেন একটু সবল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তিনি যখন তাঁহার কঠিন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার জন্য এখনও নিজেকে খাড়া রাখিতে পারিয়াছেন, তখন তাহার কি এমন বিচলিত হওয়া উচিত! এমন বিপদে মানুষ যদি মানুষকে সাহায্য না করে তাহা হইলে সে কেমন মানুষ! পরেশনাথের প্রাণটা যেন একটা ধোয়ার ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। তাহার প্রাণের সমস্ত কোয়াষা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল,

সে মহিমবাবুর কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "সে জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না! আমি এখনি তার সমস্ত ব্যবস্থা কচ্ছি।"

মহিমবাবু পরেশনাথের কথার কোন উত্তর দিলেন না, ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন, "স্বর্ণ।"

স্বর্ণ গৃহের এক কোণে দাঁড়াইয়া অঞ্চলে চক্ষুজল মুছিতে ছিল;—পিতার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। স্বর্ণ পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। সে ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র, ভয়ে আতঙ্কে তাহার একেবারে স্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরেশনাথের দৃষ্টি চকিতে একবার বালিকার মুখের উপর পতিত হইল। সে মুখখানি আজ বড় মলিন;—নয়ন বহিয়া, গণ্ড বহিয়া কেবলই অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। পরেশনাথের প্রাণটাকে কে যেন আবার শোকসমুদ্রে ডুবাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, সে স্বর্ণের সেই অশ্রুপরিপূর্ণ মুখখানির দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। কন্যা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র মহিমবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "যা মা, তোর মার আঁচল থেকে চাবিটা নিয়ে বাক্সে যে কটা টাকা আছে পরেশনাথকে এনে দে।"

স্বর্ণ কথা কহিল না, নীরবে পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিয়া গেল। মহিমবাবু নিজ মনে বলিতে লাগিলেন,

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"বাক্সে যে টাকা আছে বলে তো বোধ হয় না। মাসের প্রায় শেষ হয়ে এলো, এ সময় বাক্সে টাকা থাক্‌বে কোত্থেকে। কিন্তু টাকা না হলেও তো নয়, তারই বা কি হয়! এই বিদেশ-বিভূই,—উপায়!

"মহিমবাবুর চক্ষের সম্মুখ হইতে জগতের সমস্ত আলো যেন নিবিয়া গেল, তাঁহার মস্তিস্ক বিঘুর্ণিত হইল; ধরণী তাঁহার পদ নিম্ন হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল। তিনি আর কিছুতেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। বারান্দার রেলিং ধরিয়া ধীরে ধীরে সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। কেবল একটা নিরাশার গাঢ় দীর্ঘশ্বাস তাঁহার সমস্ত বুকখানা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহির হইয়া আসিল। পরেশনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "সে জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না,—আমি তার সমস্ত ব্যবস্থা কচ্ছি।"

মহিমবাবু মস্তকে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন, বহুকষ্টে যেন মাথাটা একটু তুলিয়া পরেশনাথের দিকে চাহিলেন; তাঁহার ভগ্ন কণ্ঠস্বর চারিদিকে বিষাদ ছড়াইয়া দিল, "পরেশনাথ, এ বিদেশ বিভূই, এখানে আমার জানা শোনা কেউ নেই, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। যা জান বাবা কর। তোমায় আর বেশী কি বলবো, আমি গরীব ছাপোষা কেরাণী, তোমার ঋণ জীবনে যে কোন দিন শোধ কর্‌তে পারবো, সে ভরসাও নেই।"

মহিমবাবুর কথার উত্তরে পরেশনাথ কি আবার বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু স্বর্ণকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সে নীরব

হইল। স্বর্ণ পিতার সম্মুখে আসিয়া অশ্রু জড়িত কণ্ঠে অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, "বাবা, বাক্সে তো টাকা নেই.— মোটে এই একটী টাকা পড়ে রয়েছে।"

আত্মীয় বান্ধবহীন সুদূর বিদেশ,—গৃহে মৃত জামাতা,—বাক্সে একটী টাকা ব্যতীত দুইটি টাকা নাই। ইহা অপেক্ষা মানুষের আর অধিক বিপদ কি হইতে পারে! মহিমবাবু কন্যার কথায় কোন উত্তর দিলেন না কেবল একবার মাত্র মাথাটা তুলিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। পরেশনাথ স্বর্ণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "টাকা পেয়েছি, টাকার আর দরকার নেই; তুমি যাও, তোমার মাকে, দিদিকে দেখগে যাও।"

স্বর্ণ কাতর দৃষ্টিতে একবার মাত্র পরেশনাথের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পরেশনাথ সেই দৃষ্টির ভিতর যাহা দেখিল, তাহা সে জীবনে আর কখনও দেখে নাই। সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়া সে যাহা পাইল, তাহা সে আর জীবনে কখনও পায় নাই। যে হৃদয় তাহার এতদিন শূন্য ছিল, তাহা যেন এক মুহূর্ত্তে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে মহিমবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি চল্লুম, যেমন করেই হোক এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত কচ্ছি।"

মহিমবাবুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর বাহির হইল, "বাবা, তোমার তো এখানে বড় কারুর সঙ্গে তেমন চেনা শোনা নেই, তার উপর

তুমি ছেলে মানুষ, একলা কি সব বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারবে। চল আমিও না হয় তোমার সঙ্গে যাই। এখন টাকার কি করি!"

পরেশনাথ মহিমবাবুকে আর কথা কহিতে দিল না, তাঁহার কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "টাকার জন্যে ভাববার আপনার মোটেই দরকার নেই, টাকা আমার কাছে আছে। এর পর সুবিধে মত দিলেই পারবেন।"

মহিমবাবু আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "পরেশনাথ তোমার ঋণ জীবনে কখনও শোধ হবে না। চল দেখি যদি লোকজন জোগাড় কর্ত্তে পারি।"

পরেশনাথ মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, "এই রাত্রে এই বিদেশে লোকজন জোগাড় হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া মেয়েদের একলা রেখে আপনার এখন বেরুনো হতেই পারে না। এখানে সকলেই প্রায় গরুর গাড়ী করে মড়া নিয়ে যায়। আপনি বাড়ীতে থাকুন, আমি যাচ্ছি, দেখি কতদূর কি জোগাড় কর্ত্তে পারি।"

মহিমবাবু কেবলমাত্র বলিলেন, "যা ভাল বিবেচনা হয় কর।"

পরেশনাথ আর অপেক্ষা করিলেন না, একটা হ্যারিক্যান লণ্ঠন হস্তে লইয়া সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। রস্তার জমাট অন্ধকার বিকট দৈত্যের মত চারিদিক হইতে যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল।

সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দৃঢ় করিয়া দ্রুত গতিতে কোন ক্রমে যাইয়া নিজের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রয়োজন মত টাকা সংগ্রহ করিয়া একজন বেহারাকে সঙ্গে লইয়া গরুর গাড়ী ও কাষ্ঠের সন্ধানে বাজারের দিকে রওনা হইল।

রাত্রি হা হা করিতেছে। বাজারে সমস্ত দোকান পাঠ বন্ধ। কোথাও জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। কালো আকাশ, কালো মেঘে একেবারে ভরাট হইয়া গিয়াছে। বাজারের অবস্থা দেখিয়া পরেশনাথের বুকের ভিতরটা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এক্ষণে কি করিবে, কি না করিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। বহুক্ষণ বাজারের এদিক ওদিক ঘুরিয়া হতাশ হইয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় তাহার সহিত একজন চৌকিদারের সাক্ষাৎ হইল। পরেশনাথ হাতে যেন স্বর্গ পাইল, সে চৌকিদারকে কিছু বক্‌সিস স্বীকার করিয়া তাহার সাহায্যে বহুকষ্টে কাঠ ও গরুর গাড়ী সংগ্রহ করিল। যখন কাঠ ও গরুর গাড়ী লইয়া মহিমবাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। আকাশে কালো মেঘ অনেকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে, শুকতারা দক্‌দক্ করিয়া জ্বলিয়া যেন সমস্ত জগতকে বলিয়া দিতেছে, "আর রাত্রি নাই,—আর রাত্রি নাই।"

কাঠ ও গরুর গাড়ী আসিবার সংবাদ বাড়ীর ভিতর পৌঁছিবা মাত্র ক্রন্দনের রোল আবার প্রবল হইয়া উঠিল। পরেশনাথের

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মনে হইল যমরাজের অনুচরবর্গ তাহার চারি পার্শ্বে একটা বিভৎস নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে যত শীঘ্র সম্ভব মহিমবাবুর জামাতার মৃতদেহ গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গরুর গাড়ী মৃতদেহ লইয়া শ্মশানের দিকে রওনা হইল। মহিমবাবু গরুর গাড়ীর সহিত আসিতেছিলেন, কিন্তু পরেশনাথ কিছুতেই তাঁহাকে আসিতে দিল না; সে একাকী সেই শেষ রাতে মহিমবাবুর জামাতার শেষ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য যাত্রা করিল। তখন ধরণী ব্রাহ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রজনীর গাঢ় কালিমা অঙ্গ হইতে মুছিয়া ফেলিতেছিল। গাছের পাতার অন্ধকারের ভিতর হইতে বায়সগণ কা কা রবে উষা-সতীর আহ্বান সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিয়াছিল; নবজীবন লইয়া ধরণী নব আলোয় ফুটিয়া পড়িবার জন্য যেন একটা আকুল আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতা মহানগরী আলোকমালায় পরিবেষ্টিত হইয়া সন্ধ্যার ম্লান ছায়ার ভিতর হইতে ধীরে ধীরে যেন জাগিয়া উঠিতেছিল। সারিবন্দি ছোট বড় সৌধ-শিখর-পুঞ্জের আলিসার নিচে নিচে সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। গলিটি ক্ষুদ্র, বাড়ীখানিও ক্ষুদ্র,—তাহারই নিচের বাহিরের ঘরে একখানি তক্তপোষের উপর মহিমবাবু একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গালে হাত দিয়া নীরবে আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিলেন। গৃহে আসবাব পত্র একরূপ নাই বলিলেই হয় - কেবল এক কোনে একটী প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিয়া ঘরখানাকে অন্ধকারের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু ক্ষুদ্র প্রদীপ, শক্তি অল্প, অন্ধকারের কোল হইতে ঘরখানাকে সে সম্পূর্ণ টানিয়া বাহির করিতে পারে নাই, তবে উপরের কালো ছোপটা কতকটা সরাইয়া দিয়াছিল। সেই আলো অন্ধকারের ভিতর বসিয়া চিন্তার স্রোতে মহিমবাবু নিজেকে একেবারে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

আজ ঠিক তিন মাস হইল তাঁহারা মধুপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কালের প্রলেপ খাইয়া জামাতার শোকটাও অনেকটা

কমিয়া আসিয়াছে। কন্যার বিবাহে, জামাতার চিকিৎসায় তিনি একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন বলিলেই হয়। কন্যার বিবাহের সময়ই বাড়ীখানি বন্ধক পড়িয়াছিল, তাহা সুদে আসলে এক্ষণে এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে তাহা আর রক্ষা হওয়া অসম্ভব, অতি শীঘ্রই বিক্রয় হইয়া যাইবে। ভরসার মধ্যে এক্ষণে কেবল মাসিক বেতন পঞ্চাশটি টাকা। কিন্তু মধ্যম কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়; কন্যার বিবাহের বয়স বহুদিনই উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে পাড়ার অনেকে অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর অপেক্ষা করা কিছুতেই চলে না। পিতার অর্থ বাড়ুক আর নাই বাড়ুক কন্যার বয়স বাড়িবার বিরাম নাই। মহিমবাবু একাকি পড়িয়া পড়িয়া সেই সকল কথাই চিন্তা করিতে-ছিলেন, সেই সময় আনন্দময়ী ধীরে ধীরে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। মহিমবাবুর সংসারে এতদিন তিনি আনন্দময়ী রূপেই বিরাজ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট যাহারা আসিয়াছে, তাহারাও তাঁহার সংস্পর্শে আনন্দ পাইয়াছে কিন্তু আনন্দময়ীর সে আনন্দ আর নাই। জামাতার মৃত্যুর পর তাঁহার মুখের হাসি চিরদিনের মত মিলাইয়া গিয়াছে। চক্ষের সম্মুখে বালিকা বিধবা কন্যার মলিন মুখ দেখিলে জননীর প্রাণে কি সুখ থাকিতে পারে! আনন্দময়ীর গৃহ প্রবেশের শব্দে মহিমবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। আনন্দময়ী পতির সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছিলেন, পতির মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দিন রাত এমন করে আর ভেবে কি করবে বল? যা হবার তাত হয়ে গেছে। ভগবান স্নেহের বরাতে যখন সুখ লেখেননি তখন ভেবে আর তুমি কি করবে বল? ভেবে ভেবে শেষ কি নিজে একটা বেঘোয় পড়বে। নাও উঠে বোস,—অমন করে কি দিন রাত গালে হাত দিয়ে বসে থাক্‌তে আছে! তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি যদি অমন উতলা হও, তা হলে আমি কার মুখ চেয়ে বুক বাঁধবো বল?"

মহিমবাবু পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। আনন্দময়ী নীরব হইবা মাত্র একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস তাঁহার সমস্ত বুকখানা কাঁপাইয়া বাহির হইয়া আসিল। চিরদিনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যায় করিয়া তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, সেই জামাতা তাঁহাকে ধনে প্রাণে মজাইয়া চির দিনের মত চলিয়া গিয়াছে। এ বেদনা কি মানুষ সহ্য করিতে পারে! তাঁহার যে বক্ষের পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহিমবাবু কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, একটা উদাস দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিলেন। আনন্দময়ী পুনরায় বলিলেন, "তবুও গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলে!"

মহিমবাবু মাথা তুলিলেন; তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, "না,—ভাববো আর কি? ভাববার যা সব শেষ হয়ে গেছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন,"স্নেহের তো যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন যে কনকের একটা বিয়ে না দিলেই নয়। তাকে তো আর রাখা যায় না। এরই মধ্যে পাড়ার দশ জনে দশ কথা বলতে আরম্ভ করেছে কিন্তু কি করি, হাতে একটাও যে টাকা নেই। বাড়ীখানারও যা অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে উহাও বোধ হয় শীঘ্রই বিক্রী হয়ে যাবে। বাড়ী যাক্; মেয়ে বিধবা হক, তবু মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। নইলে জাত যাবে। স্নেহের বিয়ের জন্যে অনেক ভেবেছিলেম, এখন তার জন্যে তো নিশ্চিন্ত হয়েছি—কিন্তু কনকের বিয়ের কি করি?"

মহিমবাবুর কণ্ঠ রোধ হইল; আনন্দময়ী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের আফিসের যে পাত্রটির কথা বলেছিলে সেটির কি হলো? তার তো সম্প্রতি স্ত্রী মারা গেছে শুনেছিলুম, তার নাকি মোটে খাই নেই,—সেইটিই না হয় জোগাড় কর না!"

মহিমবাবু পত্নীর কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "খাই নেই বটে—কিন্তু মেয়ের বিয়ে, তিন চারশো টাকাও তো চাই, আমার যে এক পয়সাও জোগাড় করবার উপায় নেই, এখন দু তিনশো টাকা পাবো কোথায় বল? তা ছাড়া সে পাত্রের বয়স যথেষ্ট হয়েছে, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া আর মেয়েকে হাত পা

বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া একই কথা। কিন্তু তাও না হয় দিলুম, তবুও যে টাকা চাই।”

আনন্দময়ী স্বামীর কথায় বাধা দিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, “বরাতে যদি তার সুখ থাকে, তবে উহা হইতেই হবে—স্নেহের জন্যে তো দেখতে শুনতে কিছু কসুর করনি, কিন্তু ভগবান সুখ না দিলে কি কারুর সুখ হতে পারে! তুমি আর দ্বিধা করো না, ওই পাত্রই স্থির কর, আমার এখনও যা গহনা আছে, তাতে তিন চারশো টাকা পাওয়া যাইবেই।”

মহিমবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন, “মেয়ের বরাতে যা আছে তাই হবে; যখন পয়সা নেই তখন আর ভাল মন্দ বিবেচনা করিবারও অধিকার নেই। কাল সেই পাত্রটিকেই দেখি সে কি বলে? কনককে হাত পা বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিয়ে, স্বর্ণকে সানে আছড়ে মেরে তবে যদি নিশ্চিন্ত হতে পারি। ছেলে না হয়ে যখন আমার উপরি উপরি তিনটি মেয়ে হয়—তখন বন্ধুরা আমায় বলেছিল মহিমকে এইবার ভিটে বিক্রী করালে, কিন্তু আমি বড় গলায় বলেছিলুম, ছেলের চেয়ে মেয়ে ঢের ভাল। ছেলেকে নিয়ে চিরকাল জ্বলতে হয়—কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, মেয়ে আর ছেলেয় তফাৎ কত। বাঙ্গালীর মেয়ের চোখের জলে, দীর্ঘশ্বাসে বঙ্গসমাজ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তবু তো বাঙ্গালীর চৈতন্য হয় না।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহিমবাবু নীরব হইলেন, চিন্তার পর চিন্তা, শত সহস্র চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে ক্রমেই বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল। এত দিন তাঁহার সংসারে কোনই অভাব ছিল না, আনন্দ ও হর্ষে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার তিনটি কন্যা মোমের পুতুলের ন্যায় স্নেহের নির্ঝর সৃষ্টি করিয়া শশিকলার মত বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের সেই সুন্দর মুখের মধুর হাসি মহিমবাবুর প্রাণের ভিতর নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করিত। কিন্তু দুর্জ্জয় কাল এক নিশ্বাসে সমস্ত ওলোট পালোট করিয়া দিয়া গিয়াছে। কন্যাদিগের মুখে আর সে হাসি নাই, সংসারে আর সে স্বচ্ছন্দতা নাই। অভাবের হাহাকার, দৈন্যের অট্ট হাসি চারিদিকে যেন একটা দুঃখের জাল বিস্তার করিয়া সমস্ত সংসারটি ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। নিস্তব্ধ গৃহ, কাহারও মুখে কথা নাই। কেবল মহিমবাবুর ঘন ঘন নিশ্বাস সেই স্তব্ধ নীরবতাকে বিচলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। আনন্দময়ী বহুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা তোমার সঙ্গে, পরেশনাথের দেখা শুনো হয়েছিলো? কল্‌কাতায় সে ফিরে এসেছে, না এখনও মধুপুরে আছে? আহা অমন ছেলে আর হয় না।"

মহিমবাবু আবার মাথা তুলিলেন, পত্নীর কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "পরেশ মধুপুর থেকে ফিরে এসেছে, আমার সঙ্গে

রাস্তায় তার একদিন দেখা হয়েছিল। তার ঋণ কি জীবনে কখনও শোধ করতে পারবো। সে রাত্রে, সে না থাকলে কি হতো ভগবান তা বলতে পারেন। আমরা তার কে বল, দুচার দিনের আলাপ বইত নয়, কিন্তু সে দিন নিজের পয়সা ব্যয় করে আমাদের বিপদ যেন তার নিজের বিপদ বলে মাথা পেতে নিয়ে ছিল। পরেশের মত ছেলে হাজারে একটা পাওয়া যায় না।"

পরেশনাথের কথায় কৃতজ্ঞতার কয়েক ফোটা অশ্রু আনন্দময়ীর নয়ন কোণে উছলিয়া উঠিল, তিনি অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া, গাঢ় স্বরে বলিলেন, "ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। দেখ, সে কিন্তু আমাদের স্বর্ণকে বড় ভালবাসে। তাকে বললে সে হয়ত স্বর্ণকে বিয়ে কর্ত্তে পারে।"

একটা বিষাদ হাসি গোপের পাশ দিয়া বাহির হইয়া মহিমবাবুর মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল, তিনি পত্নীকে বাধা দিয়া বলিলেন, "গিন্নি আমাদের কি সে বরাৎ! সেই বরাতই যদি হবে, তাহ'লে স্নেহের কপাল ভাঙ্গবে কেন? গিন্নি এত বড় আশা করো না। পরেশ কে তা কি জান, শম্ভুনাথবাবু কলকাতার মধ্যে একজন মস্ত বড়লোক, পরেশ তারই একমাত্র ছেলে। তাকে জামাই করিবার জন্য কলকাতার প্রায় সমস্ত বড়লোকই ব্যগ্র। আমাদের মত গরীব—যাদের দু'বেলা দুমুটো খাবার সংস্থান নেই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাদের ঘরের মেয়ে কখন কি শম্ভুনাথ বাবুর ঘরে স্থান পায়! গিন্নি, গরীব গরীবের মত লোভ কর, যা হবার নয় তা মনেও স্থান দিও না।"

পরেশনাথকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে জামাতা করিবার ইচ্ছা আনন্দময়ীর প্রাণের এক কোণে একটু স্থান পাইয়াছিল, তাহার পর পরেশনাথের সহিত আলাপটা যতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সে ইচ্ছাটাও ধীরে ধীরে বেশ একটু স্থান করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহা পূর্ব্বে কোন দিন প্রকাশ পায় নাই, তাহার কারণ আনন্দময়ী জানিতেন পরেশনাথ ধনির পুত্র, তাহার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ সম্ভব নয়। আজ স্বামীর সহিত কথা কহিতে কহিতে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর কথায় আনন্দময়ীর প্রাণের ইচ্ছা প্রাণেই মিশাইয়া গেল, তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিসে কি হয় বলা যায় না তো; সে যাক্ এখন কনকের যা হয় একটা কালই ব্যবস্থা কর। তোমাদের আফিসের সেই বাবুটিকে কালই সঙ্গে করে নিয়ে এস, মেয়ে যদি পছন্দ করে, যত শীঘ্র হয় বিয়েটা শেষ করে ফেল, তার পর স্বর্গের বরাতে যা আছে তাই হবে।"

মহিমবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় একখানা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। এত রাত্রে গাড়ীতে আবার কে আসিল দেখিবার জন্য মহিমবাবু বেশ একটু ব্যস্ত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "গাড়ী-খানা আমাদের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল না? তুমি একবার ভেতরে যাও দেখি কে আবার এলো!"

আনন্দময়ী অন্তঃপুরের ভিতর যাইবার জন্য ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর গৃহ হইতে বাহির হইতে হইল না। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, পরেশনাথ! সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সম্মুখে আনন্দময়ীকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; বলিল, "রোজই আপনাদের বাড়ী আসবো ভাবি, কিন্তু নানা কাজে আসা আর কিছুতেই ঘটে উঠে না। অনেকটা দূর, তাই এত দিন আপনাদের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পারিনি। তারপর আপনারা সব ভাল আছেন তো?"

আনন্দময়ী অবগুণ্ঠনটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিলেন, মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "হাঁ বাবা, আমরা সবাই ভালো আছি। তোমার শরীর বেশ ভালো, তোমার বাবা মা ভাল আছেন?"

পরেশনাথ মস্তক নাড়িয়া উত্তর দিল; "আজ্ঞে হাঁ, আমি বেশ ভালই আছি!"

পরেশনাথকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহিমবাবুও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; বলিলেন, "এস, বাবা এস, এতক্ষণ আমরা তোমারই কথা বলছিলাম, তোমার ঋণতো জীবনে কখন

পরিশোধ করিতে পারিব না। পরেশনাথ লজ্জা ও সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। এমন সময় স্নেহ আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল এবং অপরিচিত একজন লোককে তক্তপোষের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল কিন্তু আনন্দময়ী ডাকিলেন, "কেনরে স্নেহ! চলে যাচ্ছিস্ যে! ও যে পরেশনাথ,—চিন্তে পাচ্ছিস্‌নি?"

জননীর নিষেধে স্নেহ দাঁড়াইয়াছিল,—পরেশনাথের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। শুভ্র থান পরিহিত একি মূর্ত্তি! নিরাভরণা, শুভ্রবসনা বিষাদমাখা মূর্ত্তিখানির দিকে চাহিয়া পরেশনাথের সমস্ত প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। প্রথম যৌবন যখন সবে মাত্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল,—যখন বাসনার নদীতে সবে মাত্র জোয়ারের সূচনা হইতেছিল, তখন এতবড় ত্যাগ এ কেবল বঙ্গবালাতেই সম্ভব! পতির চিতায়, বাসনা কামনা সমস্ত ভস্মিভূত করিয়া, স্মৃতির পূজায় যাহারা এক দিনে ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুর পবিত্র করিতেছে, তাহাদের দিকে চাহিলে কাহার না গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে! এ পবিত্র ত্যাগের মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গ-জননীও আজি গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, পরেশনাথ তাহা যেন চক্ষের উপর দেখিতে পাইল। সে অধিকক্ষণ সে মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, একটা অসীম ভক্তিতে আপনা হইতেই তাহার মস্তক নত হইয়া পড়িল।

আনন্দময়ী স্নেহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পরেশনাথকে, স্নেহ তুই চিন্‌তে পারলিনি ?"

স্নেহ ঘাড় নাড়িয়া অতি করুণকণ্ঠে উত্তর দিল, "চিন্‌তে পারবো না কেন মা, চিন্‌তে তো পেরেছি।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তবে তুই যা, স্বর্ণকে পাঠিয়ে দিগে, বল পরেশনাথ এসেছে।"

স্নেহ চলিয়া গেল,—পরেশনাথ ঘাড় তুলিয়া বলিল, "আমি স্নেহকে চিন্‌তেই পারিনি, এ বেশে ত তাকে আমি কখনও দেখিনি। স্নেহকে একেবারে চিন্‌তেই পারা যায় না।"

পরেশনাথের কথায় পুরাতন বিস্মৃত স্মৃতিতে আবার ঘা লাগিল, আনন্দময়ীর চক্ষে জল আসিল; তিনি অঞ্চলে চক্ষুজল মুছিলেন। মহিমবাবু উত্তর দিলেন, পরেশনাথ সবই বরাত। তা নইলে কখনও এমন সোণার প্রতিমার—এমন হয়—"

মহিমবাবু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু স্বর্ণকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "স্বর্ণ, দেখদেখি কে এসেছে।"

পিতার কথায় স্বর্ণের দৃষ্টি পরেশনাথের উপর পতিত হইল। হর্ষ তাহার মুখ চোখের উপর একটা হাসির রেখা টানিয়া দিল, সে একেবারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। স্বর্ণকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া পরেশনাথও মৃদু মৃদু

হাসিতেছিল। স্বর্ণের লজ্জায় জড়সড় দেহখানি আজ তাহার নয়নে বড়ই সুন্দর ঠেকিল। মহিমবাবু স্বর্ণের দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, "যা পরেশনাথের কাছে যা, জিজ্ঞাসা কর কেমন আছে।"

পিতার কথায় রাজ্যের লজ্জা আসিয়া স্বর্ণকে যেন একেবারে বেষ্টন করিয়া ধরিল। লজ্জায় তাহার সমস্ত কথা জড়াইয়া গেল, সে পিতার আদেশে কেবল ধীরে ধীরে যাইয়া পরেশনাথের পার্শ্বে দাঁড়াইল। পরেশনাথ তাহার হাতখানি ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণের উপর হইতে যেন একখানা কাল পর্দ্দা সরিয়া গেল। সে অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বর্ণ! আমায় চিনতে পারছ ?"

স্বর্ণ মৃদু হাসিয়া কেবলমাত্র ঘাড় নাড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। শম্ভুনাথ বাবু অন্তপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবর একেবারে শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ গা, বলি পচু এখনও বাড়ী ফিরলে না কেন? রাত যে ঢের হ'লো? বলি কোন বিপদাপদ হ'লো নাতো। কলকাতার সহর, জায়গা তো বড় ভালো নয়।"

বাড়ীতে পরেশনাথকে সকলে পচু বলিয়া ডাকিত। শম্ভুনাথ-বাবু যে ঘরখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন, সে ঘরখানা আগাগোড়া শ্বেতপাথরে বাঁধান। ঘরের চারিদিকে প্রাচীরের গায়ে উত্তম ফ্রেমে বাধান বড় বড় দেবদেবীর ছবি ও বড় বড় আয়না। এক পার্শ্বে একখানি খাট, তাহার উপরিস্থিত মোটা গদির উপরে বিছানা, রাজহংসের পালকের মত সাদা ধবধব করিতেছে। পালঙ্কের সম্মুখে প্রাচীরের গায়ে গায়ে সারি সারি কয়েকটা গ্লাসকেশ,—তাহা বহুমূল্য আসবাবে পরিপূর্ণ। একপার্শ্বে একটা ব্রাকেটের উপর প্রকাণ্ড ঘড়ি টক্ টক্ করিয়া সময় নির্দ্ধারণ করিতেছে। গৃহের মেঝের উপর বসিয়া একখানা রামায়ণ কোলে করিয়া শ্যামাসুন্দরী ঢুলিতেছিলেন। শ্যামাসুন্দরী মল্লিকবাবুর পত্নী,—তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে,—বর্ণ রীতিমত গৌর, মুখশ্রীও

সুন্দর কিন্তু দেহ অতিরিক্ত স্থূল হওয়ায় সেই সুন্দর মূর্ত্তির এক্ষণে আর সুন্দরত্ব বলিতে যাহা, তাহার আর কিছুই নাই। শ্যামাসুন্দরী তাঁহার দেহের ভারে এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সংসারের তিনি কার্য্যই করিতে পারিতেন না। যেখানে বসিতেন সেইখানেই তাঁহার সমস্ত দিনটা কাটিয়া যাইত। নড়িতে চড়িতে তিনি একেবারেই পারিতেন না বলিলেই হয়। সংসারের কাজে যদি কখনও তাঁহাকে একটু আধটু নড়িতে চড়িতে হইত, তাহা হইলে তিনি মহা বিরক্ত হইয়া পড়িতেন। কাজেই তিনি সংসারের কোন ধারই ধারিতেন না, বাটীর দাসদাসীর দ্বারাই সে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইত। স্বামীর স্বর কণ্ঠে প্রবেশ করায় শ্যামাসুন্দরীর চমক ভাঙ্গিল, তিনি তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া রামায়ণখানি তুলিয়া লইলেন। পত্নীকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া শম্ভুনাথবাবু আবার বলিলেন, "বলি শুন্‌ছো। পচু এখনও বাড়ী ফির্‌লে না কেন বল্‌তে পারো! সে কোথায় গেছে তোমাকে কি কিছু বলে গেছে?"

এতক্ষণে স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্যামাসুন্দরীর কর্ণে প্রবেশ করিল। পরেশনাথ এখনও বাড়ী ফেরে নাই, শুনিয়া তাঁহার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। একমাত্র পুত্রের জননীর প্রাণ পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হইয়া থাকে,—শিবরাত্রের সলিতা, নিবিতে কতক্ষণ! তিনি স্বামীর মুখের দিকে বিহ্বলভাবে চাহিয়া বলিলেন, "কি বল্লে, পচুর কি হয়েছে?"

শম্ভুনাথ বাবু পত্নীর কথায় বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, "হবে আবার কি! জিজ্ঞাসা কচ্ছি, পচু এখনও বাড়ী ফিরলে না, রাততো এগারোটা বেজে গেল, কোথায় গেছে কিছু বলে গেছে?"

শ্যামাসুন্দরী পুত্রের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মহা চিন্তিত স্বরে বলিলেন, "কই আমাকে তো কিছু বলে যায়নি। রাত্রি তো ঢের হ'লো, সে এখনও ফেরেনি? এমন রাত্তির তো তার কখনও হয় না! এখনও না ফেরবার কারণ কি?"

শম্ভুনাথ বাবু মহা চিন্তিতভাবে পালঙ্কের উপর যাইয়া বসিলেন। চিন্তার রেখা তখন তাঁহার মুখের উপর বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কিছুক্ষণ পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া হাঁকিলেন, "ওরে কে আছিসরে, এক কল্কে তামাক দিয়ে যা।"

তাঁহার স্বর ভৃত্যের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র একজন উড়িয়া বেহারা একটা কলিকায় ফু দিতে দিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সে গুড়গুড়ির উপর কলিকাটা বসাইয়া দিয়া তাহার নলটা শম্ভুনাথ বাবুর হস্তে দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। শম্ভুনাথ বাবু কিছুক্ষণ গুড়গুড়ির নলটায় ধীরে ধীরে টান দিয়া কতকটা ধূম শূন্যে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তাইতো এ যে মহা ভাবনায় ফেললে হে, রাততো ক্রমেই বেড়ে চললো—ছেলেটা গেল কোথায়?"

শ্যামাসুন্দরীও পুত্রের ভাবনা ভাবিতেছিলেন,—কলিকাতার

রাস্তায় পদে পদে বিপদ। তিনি যতই পুত্রের ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন ততই কুভাবনাগুলা কেবল কুকথা গাইয়া তাঁহার প্রাণের ভিতর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। স্বামীর কথায় তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "যেখানে যেখানে যাবার সম্ভাবনা, একবার লোক পাঠিয়ে সন্ধান নিলে হয় না! রাততো ঢের হয়েছে,—এত রাত্তির তো তার কখনও হয় না।"

শম্ভুনাথবাবু আবার কতকটা ধোয়া শূন্যে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "না আর স্থির হয়ে বসে থাকা একেবারেই যায় না। সন্ধান নেওয়া এখনি উচিত। ওরে কে আছিস্ একবার সরকার মশাইকে পাঠিয়ে দে দেখি।"

বেহারা বাবুর আদেশের অপেক্ষায় দ্বারের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল,—বাবুর আদেশ পাইবামাত্র সে সরকার মাহশয়কে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ সরকার সবে মাত্র শয়নের আয়োজন করিতেছিল, বাবুর তলব পাইবামাত্র সে একেবারে হন্তদন্ত হইয়া তখনই অন্তঃপুরের দিকে ছুটিল। সরকার মহাশয় যখন যাইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল তখন শম্ভুনাথবাবু একটা তাকিয়ার ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া গুড়গুড়ির নলে মৃদু মৃদু টান দিতে ছিলেন; সরকার মহাশয়ের পদশব্দ পাইয়া তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন। সরকার মহাশয় দুই হস্ত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে অতি বিনীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর কি আমায় ডেকেছেন?"

শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলটা ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন, গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হাঁ, তোমায় ডেকেছি। পচু কোথায় গেছে কিছু খবর জান? রাত তো অনেক হ'লো, এখনও সে ফিরলে না, তাই ভাবছি।"

সরকার মহাশয় প্রাচীন লোক। শম্ভুনাথবাবুর নিকটই তাহার বিশ বৎসরের উপর কাটিয়া গিয়াছে। তাহার দেহ কৃশ, হাড় কয়খানা তেলে জলে পাকিয়া যেন একেবারে অটুট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে তাহার গলার পৈতাগাছটা কন্ধের উপর ফেলিয়া বলিল, "ছোটবাবু কল্‌কাতায় গেছেন,—বোধ হয় কোন বন্ধু টন্ধুর বাড়ী খাওয়া টাওয়া আছে, তাই রাত্রি হচ্ছে। বাড়ীর গাড়ী করে গেছেন, ভাবনার কিছু নেই,—এখনি এসে পড়লেন বলে। আলিবক্স গাড়ীতে গেছে কিছু ভাববার নেই। অমন কোচমান কি আর আছে।"

কোন কিছু একটা চিন্তা আসিলেই শম্ভুনাথবাবুর আর গুড়গুড়ি ছাড়িবার উপায় থাকিত না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না চিন্তাটার একটা মীমাংসা হইত, ততক্ষণ কেবলই তাঁহার তাম্রকূটের প্রয়োজন। সরকার মহাশয় নীরব হইবামাত্র তিনি বলিলেন, "ভাববার তো প্রয়োজন নেই, তুমিতো বেশ খাসা বলে ফেল্লে, কিন্তু ভাবনা যেতে চায় কই? দেখদেখি কে ওখানে আছে, চট্ করে এক কল্কে তামাক আন্‌তে বল দেখি। আর তুমি না হয় এক কাজ

কর—একখানা গাড়ী জুতে কোথায় গেল, একবার এদিক ওদিক সন্ধানটা নাও না হে।"

সরকার মহাশয় হাতটা নাড়িয়া বলিল, 'আপনি হুজুর যদি বলেন আমি না হয় বেরুচ্ছি, কিন্তু এখনও বেরুবার সময় হয়নি, ছোটবাবু এখনি এসে পৌঁছিবেন।'

শম্ভুনাথবাবু একটা বিস্মিত দৃষ্টিতে সরকার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেরুবারও একটা সময় আছে নাকি হে। আচ্ছা আর একটু অপেক্ষা করে দেখেই না হয় বেরিও। যাও এখন,—যাবার সময় এক কল্কে তামাক পাঠিয়ে দিতে বলে যেও।"

"যে আজ্ঞে", বলিয়া সরকার মহাশয় বিদায় হইলেন। বেহারা আসিয়া গুড়গুড়ির কলিকাটা বদলাইয়া দিয়া গেল। শম্ভুনাথবাবু আবার তাকিয়ার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া তাম্রকুট টানিতে লাগিলেন। তিনি গুড়গুড়ির নলটায় সবেমাত্র কয়েকটা টান দিয়াছেন, তাম্রকুট তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ধরিয়া উঠিতে পারে নাই সেই সময় নিম্নে পরেশনাথের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি একেবারে গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া দিয়া ধড়মড়িয়া পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলেন। শ্যামাসুন্দরী মহা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ওই আমার পচু এসেছে।"

শম্ভুনাথ বাবু উর্চ্চস্বরে ডাকিলেন, "পচু।"

পরক্ষণেই পরেশনাথ আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। শম্ভুনাথবাবু মহা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি কোথায় গেস্‌লেহে,—এত রাত হলো? শেষ কি একটা অসুখ বিসুখ বাধিয়ে বস্‌বে। খাওয়া হয়েছে তো?"

পরেশনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া পালঙ্কের ছত্রী ধরিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল, পিতার কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ আমি খেয়ে এসেছি। মধুপুরে যাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো,—যাদের কথা আমি আপনাদের বলেছিলুম, তাদেরই বাড়ী গেস্‌লুম।"

শম্ভুনাথবাবু আবার গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইলেন, তাহাতে গোটা দুই টান দিয়া বলিলেন, "গেস্‌লে, বেশই করেছিলে কিন্তু এত রাত কর্তে আছে। আমরা তোমার জন্যে ভেবে চিন্তে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। কল্‌কাতার রাস্তা বিপদ পায়ে পায়ে, না বলে এত রাত করা তোমার একেবারেই ভাল হয়নি।"

পরেশনাথ উত্তর দিল, "তাঁরা কিছুতেই ছাড়লেন না, খেয়ে আসতে হলো, তাই এত রাত হয়ে গেলো। তাঁদের অবস্থা ভালো নয় বটে, কিন্তু বাবা তাঁদের মতন প্রাণ খুব কম লোকেরই আছে। তাঁদের মতন ভদ্রলোক সত্যই আমি দেখিনি।"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "বটে। তবে কি জান বাপু কল্‌কাতায় কারুকে বিশ্বাস নেই। কে যে কি মতলবে

ঘুরছে ভগবনাও বলতে পারেন না। তার উপর আবার তাদের অবিবাহিত দু' দুটো মেয়ে আছে। সেখানে বেশী যাতায়াত করা আমি বড় ভাল বলে মনে করি না। তুমি আমার একমাত্র ছেলে, তোমার বিয়েতে কোন না পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবো। যেখানে সেখানে তো আর তোমার বিয়ে হবে না। কাজেই আগে থেকে একটু সাবধান থাকা উচিত।"

পরেশনাথ কোনও কথা কহিল না। তাহার প্রাণের ভিতর তখন স্বর্ণের ছবিখানি ভাসিতেছিল। পিতার কথায় সেই ছবিটার উপর যেন একটা কালো ছায়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখখানিও একটু ম্লান হইয়া গেল। শ্যামা সুন্দরী বলিলেন, "চল্ শুবি চল্; রাত ঢের হয়েছে।"

শ্যামা সুন্দরী পুত্রের শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার স্থূল দেহটিকে কোনক্রমে খাড়া করিয়া তুলিলেন। পরেশ নাথ জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু শম্ভুনাথ বাবু বাধা দিলেন। তিনি পুত্রের দিকে ফিরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দেখ বাপু আর একটা কথা তোমায় বলে রাখি, এই উদারতা জিনিষটা বড় বেশী দেখিও না। আমার বিশ্বাস ওটা কেবল মনের একটা দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। অমুক খেতে পেলে না, অমুকের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না অমনি যদি প্রাণ কেঁদে ওঠে তা হলে আমার এই এত কষ্টের টাকা তোমার

হাতে পড়লে দু দিনও থাক্‌বে না। যদি সংসারে বড় লোক হতে চাও তাহলে নজরটাকে অতি ছোট কর। নজর বড় করেছ কি দুদিনে সব ফাঁক।”

পরেশনাথ এবারও কোন উত্তর দিল না, জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কণকের বিবাহের জন্য যে মহিমবাবু বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা কল্য রাত্রিকার কথাবার্ত্তা হইতেই পরেশনাথ বুঝিয়া আসিয়াছিল। রাত্রে পরেশনাথ যখন মহিমবাবুর বাড়ী হইতে বিদায় হয় তখন আনন্দময়ী তাহাকে বার বার করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কল্য যেন অতি অবশ্য অবশ্য সে একবার সন্ধ্যার পর তাঁহাদের বাটী আইসে, কারণ সেই সময় একটী পাত্র কণককে দেখিতে আসিবে। পরেশনাথ সে কথা ভুলিতে পারে নাই, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই সে মহিম-বাবুর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বাহির হইবার জন্য সাজগোজ শেষ করিয়া সে জননীর গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। জননী শ্যামাসুন্দরী তখন গৃহের মেঝে পা মেলিয়া বসিয়া পাড়ার একটী বিধবা প্রৌঢ়ার সহিত পুত্রের বিবাহের বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, পুত্রকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মাথাটা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে পচু কোথায় বেরুচ্ছিস্?"

পরেশনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেই বিধবা প্রৌঢ়াটি বস্ত্রে আপাদ মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন, পরেশনাথ সে দিকে দ্রিক্‌পাত না করিয়াই জননীর কথায় উত্তর দিল, "মা আমি একবার

কল্‌কাতায় যাচ্ছি,—আস্‌তে বোধ হয় একটু রাত্রি হবে। আমার কল্‌কাতায় এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে।”

শ্যামাসুন্দরী পুত্রর কখন কোনও কার্য্যে বাধা দিতেন না। এ করিস্‌নে, এটা করা অন্যায় এমন কথাও তাঁহার মুখে কেহ কোন দিন শোনে নাই। পুত্রের কথায় তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “বেশতো যা না, নিমন্ত্রণে যাবি, তা আর একটু রাত হবে না। তা দেখিস্ খুব বেশী খাস্‌নি যেন; তোর তো শরীর সে রকম নয় একটু অত্যাচার কল্লেই যে অমনি অসুখ না হয়ে আর নিস্তার নেই।”

পরেশনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “বেশী খাবো কেন মা, আমার কি খাবার কিছু অভাব আছে যে নেমন্তন্নে গিয়ে বেশী খাব।”

শ্যামা সুন্দরী জীহ্বা কাটিয়া বলিলেন, “ষাট, তোর আবার অভাব কিসের, সাত নস্ পাঁচ নস্ তুই আমাদের এক মাত্র সন্তান, তোর আবার অভাব কিসের, কি বল বাউন পিসি ?”

বাউন পিসি কাপড়ের পুটুলিটির মত এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, শ্যামাসুন্দরীর কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার মাথাটা নড়িয়া উঠিল, পরেশ নাথ জননীর দিকে ফিরিয়া বলিল, “তবে মা আমি এখন চল্লুম, বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহ'লে তুমি বলো যে, আমি কল্‌কাতায় গেছি।”

শ্যামাসুন্দরী মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, “তা এস বাছা,—তা খুব বেশী যেন রাত করো না”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরেশনাথ কেবল মাথাটা নাড়িয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল কিন্তু জননীর আহ্বানে তাহাকে আবার ফিরিতে হইল। শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তবে বাছা সেখানে যেন যেও না।"

পরেশনাথ বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল,—"সেখানে, কোথায় মা?"

শ্যামাসুন্দরী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিলেন, "ওই যে বাছা, যেখানে ওনি তোমায় কাল যেতে বারন কল্লেন।"

পরেশনাথ জননীর কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "বাবা আবার কবে আমায় কোথায় যেতে বারন কল্লেন। হরি হরি হরি তুমি যেখানকার কথা বলছো, সেইখানেই তো আমার নেমন্তন্ন। মা তারা বড় গরীব, তাঁরা এত করে বলেছেন, যদি না যাই প্রাণে বড় ব্যাথা পাবেন। কারুর মনে কষ্ট দেওয়া কি উচিত! তা ছাড়া মহিমবাবুর স্ত্রী আমাকে ঠিক তোমার মতন ভালবাসেন। তুমি ছাড়া অত স্নেহ আমি মা আর কারুর কাছে পাইনি।"

পুত্রকে যে স্নেহ করিত, পুত্রকে যে আদর করিত, পুত্রের যে সুখ্যাতি করিত, তাহার ন্যায় ভাল লোক শ্যামাসুন্দরীর নিকট আর দ্বিতীয় ছিল না। পুত্রের কথায় শ্যামাসুন্দরীর প্রাণ একেবারে গলিয়া গেল, তিনি বেশ একটু করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "আহা, তা'হলেতো তারা বড় ভাল লোক। তা তারা যখন

তোকে নেমন্তন্ন করেছে তখন যাবি বইকি। কি বল বাউন পিসি, তাদের ওখানে না যাওয়া কি ভালো হয়। তারা রেঁধে বেড়ে বসে থাক্‌বে, না গেলে সত্যিইতো দুঃখ করবে। তা যাও বাছা, যত শিগ্‌গির পারো ফিরো। তাঁদের না একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, তা যে তারা বড় গরীব, নইলে তোর সঙ্গে তার বিয়ে দিতুম।"

পরেশনাথ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "গরীব বলে কি মা আর বিয়ে দেওয়া যায় না। কেন গরীব কি মানুষ নয় মা?"

শ্যামাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "মানুষ নয় কি বলছি রে, আমারা যেমন মানুষ তারাও তেমনি মানুষ। তবে কি জানিস্ তারা গরীব, তাদের তো আর পয়সা কড়ি নেই, তারা তো আর তাদের মেয়েকে কিছু দিতেথুতে পারবে না। সেখানে কি তোর বিয়ে দিতে পারি।"

জননীর কথায় পরেশনাথ মুখখানা একটু ভার করিয়া বলিল, "ও বুঝিছি! তুমি বুঝি মা তোমার ছেলেকে বিক্রী করবে! টাকা নিয়ে ছেলের বিয়ে দেবে। তোমার মা কি এতই টাকার অভাব যে ছেলেকে বিক্রী করেও টাকা নিতে হবে?"

পুত্র বিক্রয়ের কথায় শ্যামাসুন্দরীর নয়নে জল আসিল। তাঁহার সাত নয় পাঁচ নয় একমাত্র পুত্র;—পুত্র যে তাঁহার সর্ব্বস্ব। তিনি সেই পুত্রের বিনিময়ে কন্যা পক্ষের নিকট হইতে অর্থ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রহণ করিবেন কোন হিসাবে? তাঁহার পুত্র, পৌত্র পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইলেও তো তাহাদের অর্থের অভাব হইবে না। শ্যামাসুন্দরী অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "অমন কথা মুখে আনিস্‌নি। আমি ছেলে বিক্রী করবো! বালাই! ষাঠ! আমার অমন পয়সায় কাজ নেই। তুই সেই মেয়েটিকে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসিস্‌,—মেয়েটি যদি ভালো হয়, আমি তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। যেখানে যাচ্ছিস্‌ যা,—বেশী যেন রাত করিস্‌নি।"

পরেশনাথ সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে যখন কলিকাতায় মহিমবাবুর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল তখন সবে মাত্র বরপক্ষ তাঁহার দলবল লইয়া কন্যা দেখিতে উপস্থিত হইয়াছেন। তখনও কন্যা দেখান শেষ হয় নাই। পরেশনাথকে বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহিমবাবু আসন ছাড়িয়া উঠিয়া মহা ব্যস্তভাবে কহিলেন, "এস বাবা এস, বসো।"

পরেশনাথ ধীরে ধীরে যাইয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। সে একবার তীব্র দৃষ্টিতে মস্তক তুলিয়া গৃহের ভিতরে উপবিষ্ট লোক কয়টিকে দেখিয়া লইল। কল্য সে শুনিয়া গিয়াছে পাত্র স্বয়ং কন্যা দেখিতে আসিবে কিন্তু ইহার ভিতর কোনটি যে পাত্র তাহা সে কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না,—কারণ তাহার ভিতর

এমন একটিও লোক ছিল না যাহার বয়স চল্লিশের ন্যূন। যৌবনত্ব ও প্রৌঢ়ত্ব পার হইয়া মানুষ যখন বৃদ্ধত্বে পা দেয়, যখন গমনের ঘণ্টা বাজিবার আর অধিক বিলম্ব থাকে না তখনও যে মানুষ বিবাহ করিতে পারে এ জ্ঞানটুকু পরেশনাথের একেবারেই ছিল না। পরেশনাথ একপার্শ্বে যাইয়া অবনত মস্তকে বসিয়াছিল, মহিমবাবুর আহ্বানে তাহাকে আবার মস্তক তুলিতে হইল। মহিমবাবু একটি বৃদ্ধের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "পরেশনাথ এরই সঙ্গে কনকের বিবাহ এক রকম স্থিরই হয়েছে। এঁর সম্প্রতি স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় বিনা পয়সায় ইনি কনককে বিয়ে কর্ত্তে সম্মত হয়েছেন, এখন কেবল মেয়ে পছন্দ হবার অপেক্ষা, তা হ'লেই কথাটা একেবারে পাকাপাকি হয়ে যায়। আজ কালকার বাজারে এক পয়সা না নিয়ে বিয়ে করে এমন লোক প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না।"

পরেশনাথ সেই বৃদ্ধের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়াছিল। এই বৃদ্ধ যাহার সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত সেও আবার নূতন সংসার পাতিতে চায়! ইহার সহিত কনকের বিবাহ হওয়ার অপেক্ষা তাহার যে অবিবাহিত থাকাই সহস্রগুণ বাঞ্ছনীয়। পরেশনাথ বুঝিতে পারিল না কেন মহিমবাবু তাঁহার স্নেহের কন্যা, সোনার প্রতিমাকে এই স্থবির বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। পরেশনাথ অবাক হইয়া এই সকল কথাই ভাবিতে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছিল,—সেই সময়ে পাত্রের পার্শ্বে উপবিষ্ট যে বৃদ্ধটি একটা থেলো হুকায় তামাক টানিতেছিল তাঁহার ভাঙ্গা গলার চাপা স্বরে তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি দুই তিন বার কাসিয়া মুখ হইতে থেলো হুকাটা নামাইয়া বলিলেন, "মহিমবাবু এই হ'লো আসল কাজ। একটা চ্যাংড়া ভেংড়ার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া ভালো। চিরকালটা হাড়ে হাড়ে ভাজা ভাজা হতে হয়। বিয়ে কি যে জানে বোঝে তাকে মেয়ে দিলে মেয়ের বিষয় আর কোন চিন্তা কর্ত্তে হয় না। আর তা ছাড়া আমাদের রতনের পেনসেনেরও আর ছ'মাসও বাকি নেই এই ছ'মাস পরে সে পেনসেন নিয়ে মহা সুখে আপনার মেয়ের সঙ্গে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করবে।"

মহিমবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন;—বলিলেন, "তাহ'লে আমি মেয়েকে নিয়ে আসি, আপনারা একটু অপেক্ষা করুণ।"

গৃহের ভিতরস্থিত সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, হাঁ, আপনি যান,—আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই।"

মহিমবাবু গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। একজন বৃদ্ধ পরেশনাথের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ী এই কাছেই বুঝি?"

পরেশনাথ মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে না আমার বাড়ী ভবানীপুর।"

বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পিতার নাম?"

পরেশনাথ অবনত মস্তকে অতি বিনীতস্বরে উত্তর দিল, "আমার পিতার নাম শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ।"

শম্ভুনাথ ঘোষ শুনিয়া বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরেশনাথের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আপনি শম্ভুনাথ ঘোষের ছেলে, যার চালের আড়ত আছে? আগে বলতে হয়।"

আগে বলিলে বৃদ্ধ যে কি অধিক করিতেন, ভগবান তাহা বলিতে পারেন। পরেশনাথ কোন উত্তর দিল না, অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল। বৃদ্ধ আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মহিমবাবু তাঁহার কন্যাকে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করায় পরেশনাথ বৃদ্ধের হস্ত হইতে মুক্ত পাইলেন। সকলেই মেয়ে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কনক ধীরে ধীরে আসিয়া হেটমুণ্ডে সকলের মধ্যস্থলে বসিল। একজন বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তোমার নামটি কি বলোতো?"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে কনক উত্তর দিল, "শ্রীমতী কনকলতা দাসী।"

সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আহা নামটিতো খাসা— মহিমবাবু আপনার মেয়েটি অতি সুন্দরী। আর দেখবার কিছু নেই এইবার একটা শুভদিন দেখে দু'হাত এক করে দিন। নিয়ে যান মহিমবাবু আপনার মেয়েকে ভেতরে। আমাদের যা দেখবার যথেষ্ট দেখা হয়েছে। যাও মা ভেতরে যাও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহিমবাবু কনককে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। পাত্রের দল তাঁহার পর পাঁচ ছয় কলিকা তাম্রকূট পুড়াইয়া প্রস্থান করিল। আনন্দময়ী দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, পাত্রের দল চলিয়া যাইবামাত্র, দরজা খুলিয়া বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিয়া মহিমবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্লে? মেয়ে পছন্দ হয়েছে তো?"

মহিমবাবু পত্নীর কথার কোন উত্তর দিলেন না,—পছন্দ যে হইয়াছে সেইটুকু শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন। আনন্দময়ী পরেশনাথের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা পাত্রটি কেমন দেখলে, পছন্দ হোয়েছে তো?"

পরেশনাথ এতক্ষণ অবনত মস্তকে নীরবে বসিয়াছিল,—সংসার যে কি এখনও তাহার সে জ্ঞানটুকু হয় নাই। সংসারে কোন কথায় কি উত্তর দিতে হয় তাহাও তাহার জানা ছিল না। আনন্দময়ীর কথার উত্তরে ধীরে ধীরে সে মাথা তুলিয়া বলিল, "পছন্দ,—সত্য কথা বলতে কি আমার পছন্দ হয়নি। এই পাত্রের হাতে আপনারা কেমন করে কনককে দেবেন তা আমি বুঝতে পারিনি।"

আনন্দময়ীর মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল,—তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। মহিমবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "পরেশনাথ যার টাকা নেই পাত্র পছন্দ অপছন্দ বিবেচনা করবার তার কি

অধিকার আছে। মেয়ের বিয়ে না দিতে পারলে জাত যাবে, কাজেই আমার যখন পয়সা নেই তখন মেয়ের গলায় কল্‌সি বেধে গঙ্গায় ভাসিয়ে না দিয়ে একটা বিয়ে দেওয়া এই পর্য্যন্ত। কি করবো বাবা, উপায় নেই অমন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তা কেবল ভগবান জানেন। কিন্তু উপায় কি ?"

মহিমবাবুর করুণ কণ্ঠস্বরে সমস্ত ঘরখানা যেন কাঁদিয়া উঠিল। পরেশনাথ আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "দেখুন আপনারা কনকের জন্য ভালো পাত্রের সন্ধান করুণ। টাকা যা লাগে আমি মার কাছ থেকে চেয়ে যেমন করে পারি এনে দেব। আপনাদের যখন সুবিধে হবে শোধ করে দেবেন।"

পরেশনাথের কথায় পতী পত্নীর উভয়েরই নয়ন কৃতজ্ঞতার জলে ভরিয়া উঠিল। আনন্দময়ী গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা আমি প্রাণ থেকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি তুমি চিরদিন সুখে থাকবে, কখন কোন বিপদ তোমার ছায়াও মাড়াতে পারবে না।"

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিলেন, পরেশনাথ মস্তক অবনত করিয়াছিল এক ফোটা অশ্রু দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় তাহার মস্তকের উপর ঝরিয়া পড়িল। মহিমবাবু নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "পরেশনাথ, তুমি আরজন্মে

আমাদের যে কে ছিলে জানি না, কিন্তু তুমি যা কল্লে তা পৃথিবীতে কেউ কারুকে কখন কোন দিন করেনি,—করে না। তুমি যাদেব ছেলে তাঁরা যথার্থই বড়লোক।”

মহিমবাবু আর বলিতে পারিলেন না আবেগে তাহার গলা জড়াইয়া আসিল। কৃতজ্ঞতায় নয়ন ভরিয়া উঠিল। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রত্যহই প্রত্যূষে শম্ভুনাথবাবুর বৈঠকখানা গৃহ একেবারে মহা সরগরম হইয়া উঠিত। দালালে, ব্যাপারীতে, সরকারে, গমস্তায় ঘরখানি এমনি ভরিয়া উঠিত যে, আর এক তিলও স্থান থাকিত না। সে দিন প্রত্যূষেও যথা নিয়মে বৈঠকখানা গৃহ সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসের আসেপাশে বিস্তর লোক উপবিষ্ট, সকলেই পরস্পর পরস্পরের সহিত ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। ফরাসের মধ্যস্থলে একখানা ট্রের উপর কাগজের টুক্‌রার মোড়কে হরেক রকম চাউলের নমুনা রক্ষিত, তাহা সকলেই মাঝে মাঝে এক একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। শম্ভুনাথবাবু তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই, সকলেই বেশ উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। বৃদ্ধ সরকার মহাশয় ফরাসের মধ্যস্থলে একটা হাত বাক্সের উপরে রাখিয়া একখানা প্রকাণ্ড খাতা লিখিতেছিল, একব্যক্তি তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুর আস্‌তে আর বিলম্ব কত?"

সরকার মহাশয় মস্তক না তুলিয়াই উত্তর দিল, "আর বিলম্ব নেই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভৃত্য আসিয়া গুড়গুড়ির উপর কলিকা বসাইয়া দিয়া গেল। বাবু আসিবার ইহাই সংকেত। বাবু আসিতেছেন বুঝিয়া সকলেই বেশ একটু ভালো হইয়া বসিল। ভৃত্য গুড়গুড়ির উপর কলিকা বসাইয়া গৃহ হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শম্ভুনাথবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শম্ভুনাথবাবুকে দেখিলে বেশ বুদ্ধিমান লোক বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার বয়স এক্ষণে প্রায় ষাটের নিকট গিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি বেশ কর্ম্মক্ষম। দেহের মধ্যে তাঁহার সাদা চুল ও সাদা গোপ ব্যতীত প্রাচীনত্বের আর বিশেষ কোনই চিহ্ন নাই। তাঁহার পরিধানে চুনোট করা একখানি কালা নরুণপাড় সিমলার ধুতি; উপর অঙ্গে বেনিয়ান। শম্ভুনাথবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া অনেকেই নমোস্কার করিল। তিনি ফরাসের মধ্যস্থলে আসিয়া একটা তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইলেন। গুড়গুড়ির নলে কয়েকটা টান দিয়া কতকটা ধোয়া শূন্যে ছাড়িয়া দিয়া শম্ভুনাথবাবু সরকার মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি ছোটবাবু কাল রাত্রে কখন ফিরলো হে?"

সরকার মহাশয় হাতের কলমটা কাণে গুজিয়া, হাত দুইখানা একবার ফরাসে ঘসিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে ছোটবাবুর ফিরতে কালও একটু রাত হইছিলো বলেই বোধ হয়।"

শম্ভুনাথবাবু সরকার মহাশয়ের দিকে একটা তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া বলিলেন, "এর ভেতর হঠাৎ আবার একটা বোধ হয় ঢুকিয়ে দিলে কেন? আজ কাল কি তুমি নেশা কচ্ছো নাকি হে, যে রাত্রে কে কখন এলো তার হুস থাকে না,। তার ভেতরেও বোধ হয় দিতে হবে।"

সরকার মহাশয় মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞে তা নয়, ছোটবাবুর কাল ফিরতে একটু রাতই হয়েছিলো।"

শম্ভুনাথবাবু আবার খানিকটা তাম্রকূট ধূম শূন্যে ছাড়িয়া দিলেন; বলিলেন, "হু, পথে এস। তাই ব'ল যে কাল ছোটবাবুর ফিরতে বেশ একটু রাত হয়েছিলো। যেখানে সেখানে আর বোধ হয় বোধ হয় গুলো ঢুকিও না। চোখ চেয়ে ছিলে কি, রাত তখন কটা?"

সরকার মহাশয় মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। সকালে এত লোক থাকিতে সহসা তাহার উপর বাবুর কেন অধিষ্ঠান হইল! সে তাহার কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুখাইয়া উঠিয়াছিল। সে মস্তক অবনত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ্ঞে সময়টা তো ঠিক—"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাস্ বাস্ হয়েছে, বুঝিছি চোখই বন্ধ ছিল, এতগুলো ঘড়ি কিছু বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। যাক্ তারপর আপনাদের কি?"

আপনাদের কি বলিতে না বলিতে দালাল ও ব্যাপারিগণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চারিদিক হইতে একেবারে শম্ভুনাথবাবুকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহার পর প্রায় এক ঘণ্টাকাল দালাল ও ব্যাপারীদের সহিত চাউলের দর সম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্কের পর বৈঠকখানা গৃহ শূন্য হইতে আরম্ভ হইল। দালাল ও ব্যাপারীরা তখন সকলেই প্রায় চলিয়া গিয়াছে,—যাহারা যায় নাই তাহারাও যাইবার আয়োজন করিতেছে, সেই সময় এক বৃদ্ধ শম্ভুনাথবাবুর নিকটে একটু সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সে বিষয়টা কি হ'লো?"

শম্ভুনাথবাবু সেই লোকটার দিকে বার দুই চাহিয়া বলিলেন, "সে বিষয়টা বল্লেতো আর বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। আপনার বিষয়টার অর্থ কি ভেঙ্গেচুরে বলুন! সব বিষয় যদি যেনে মনে রাখতে হয় তাহ'লে তো সংসারে টেকাই ভার।"

বৃদ্ধ তাহার সাদা গোপটা বার দুই নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে আমি আস্‌ছি নীলরতনবাবুর বাড়ী থেকে, ছোটবাবুর বিয়ের বিষয়টা কি হ'লো সেইটার একটা পাকাপাকি জানতে।"

শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলটায় গোটা কতক জোর জোর টান দিয়া মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, ছোটবাবুর বিয়ে! হুঁ কথার মত কথা বটে। তার কি এখন কর্ত্তে হবে?"

বৃদ্ধ হাতটা নাড়িয়া বলিল, "না কর্ত্তে এমন কিছু হবে না, তবে কি জানেন, আপনি যা বলেছেন টাকাটা বড্ডই বেশী হয়ে যাচ্ছে না,—একটু কম না কল্লে ভদ্রলোক পেরে উঠ্‌বেন কেন?"

শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলটা ফরাসের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "পারতে তো তাঁকে কেউ মাথার দিব্বি দেয়নি। যদি পেরে না উঠেন তো তার এ ঝকমারিতে কাজ কি? পারবেন কি না পারবেন এসব দেখতে গেলে সংসারে থাকা চলে না, তাহ'লে ফকিরি নিতে হয়। সংসার বড় শক্ত জায়গা,—এখানে ওসব বুজ্রুকি করেছ কি পথে বসেছ।"

বৃদ্ধ নীলরতনবাবুর জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে, সে সহজে হটিবার পাত্র নয়। শম্ভুনাথবাবুর রসশূন্য খটখটে কথাগুলা তাহার কর্ণে একেবারে বেসুরা বাজিলেও সে পুনরায় বলিল, "আপনি যা যা চেয়েছেন, তিনি সে সব বিষয়েই রাজি, তবে কি জানেন নগদ দশহাজার টাকাটা যা চেয়েছেন সেটা বড় বেশী বলে মনে হচ্ছে না,—ওই বিষয়টা যদি একটু বিবেচনা করেন—"

বৃদ্ধকে কথা শেষ করিতে হইল না, তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; শম্ভুনাথবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আবার ওই বিবেচনা! বলি বিবেচনা করে কি আপনার বাবু আপনার মাইনে কিছু বৃদ্ধি করে দিয়েছেন? কথায় কথায় যদি বিবেচনা এসে মাঝখানে দাঁড়ায় তা হ'লে তো এক পাও চলা যায় না। মুটের মোট বইতে কষ্ট হয় সেখানে অমনি বিবেচনা এলেন কাজেই আর মোট বয়ান হ'লো না। গাড়ী টানতে ঘোড়ার কষ্ট হয় বিবেচনা এলেন, গাড়ী চড়া হ'লো না। এই রকম যদি প্রতিপদে বিবেচনা মশাই উপদ্রব

করেন তা হ'লে কাপড় ফেলে গাছতলায় গিয়ে বস্‌তে হয়। সংসারে ঢুকে ওই বিবেচনাটাকেই সবার আগে হত্যা কর্ত্তে হয়; এই হ'লো সংসারের সার নীতি। আপনার বাবুকে বলবেন, মেয়ে হবার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল, এখন আর বিবেচনা ফিবেচনার সময় নেই। তবে বাজারে কুচোচিংড়িও পাওয়া যায় তপসেও পাওয়া যায় কিন্তু বাজার যেমনই হক্‌ তপসের দর কোন দিনই কুচোচিংড়ীর সমান হবে না।"

বৃদ্ধ এক বিবেচার হাঙ্গামায় পড়িয়াই হাপাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আর কোন কথা বলিতে সাহস হইল না, সে মস্তক বার দুই চুল্‌কাইয়া বলিল, "তাহ'লে সেই কথাই বাবুকে বল্‌বো। এখন তবে আমি উঠি।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "হাঁ, আপনার বাবুকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে বল্‌বেন, যে বিবেচনা করেচেন কি মরেচেন।"

বৃদ্ধ আর দাঁড়াইল না তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা নমোস্কার করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। শম্ভুনাথবাবু উঠিলেন,—বৈঠকখানা গৃহ হইতে বরাবর যাইয়া একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিম্নে রন্ধনগৃহের সম্মুখস্থ বারন্দার উপর পরেশনাথ আহারে বসিয়াছিলেন, শ্যামাসুন্দরী গৃহের সম্মুখে বসিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে ছিলেন। শম্ভুনাথবাবুকে আসিতে দেখিয়া তিনি মস্তকের উপর কাপড়টা তুলিয়া দিলেন। শম্ভুনাথবাবু পত্নীর সম্মুখস্থ

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি কাল কত রাত্রে ছেলে ফিরলো গো?"

শ্যামাসুন্দরী মুখটা তুলিয়া উত্তর দিলেন, "লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন গেলে একটু রাত হয়েই থাকে! দশজনকে খাওয়াতে গেলেই রাত হয়ে যায়।"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "তাতো যায়, কিন্তু ছেলের যে শরীর ভালো নয়, শেষ একটা শক্ত ব্যায়রাম হ'লেই সে মুস্কিল; নইলে আর কথা কি! পরের বাড়ী খাওয়ায় লাভ ভিন্ন যে লোকসান নেই তাকি জানিনি, তবে কথা হচ্ছে এই দেহটাতো বজায় থাকা চাই।"

শ্যামাসুন্দরী স্বামীর সম্মুখে হাতটা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার যেমন কথা একদিন নেমন্তন্ন খেলে নাকি আবার কারুর অসুখ হয়।"

"না হ'লেই ভালো! তবু কি জান একটু সাবধান থাকতে দোষ কি?" শম্ভুনাথবাবু কথাটা শেষ করিয়াই উপরে উঠিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু পত্নীর স্বরে ফিরিলেন; শ্যামাসুন্দরী এক গাল হাসিয়া মাথার কাপড়টা মাথার উপর আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ একটী বেশ ভালো সুন্দরী মেয়ে আছে, পচুর সঙ্গে তার বিয়ে দেবে? কিন্তু তারা ভারি গরীব এক পয়সাও খরচ কর্ত্তে পারবে না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "গরীবের সঙ্গে কখন বড় লোকের ছেলের বিয়ে হয়! কাঁচকলা কি গরম মসলা দিয়ে রান্না চলে! তাতে মাঝখান থেকে হয় কি জান, কাঁচকলারও আস্বাদ পাওয়া যায় না, গরম মসলারও গন্ধ থাকে না। লাভের মধ্যে লাভ দু'টো জিনিষই নষ্ট। পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর হচ্ছে টাকা। যেখানে টাকা নেই সেখানে কিছুই সুন্দর নয়।"

স্বামীর কথায় শ্যামাসুন্দরীর মুখখানি একবারে ভার হইয়া উঠিল, তিনি বেশ একটু কুপিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার ওই এক কথা, শুধু টাকা আর টাকা। টাকা যে কি হবে তার কোন হিসেব নেই। আমি কিন্তু ছেলের বিয়েতে টাকা নিয়ে ছেলে বিক্রী কর্ত্তে পারবো না তা কিন্তু তোমায় আগে থাকতে বলে রাখ্‌ছি।"

শম্ভুনাথবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে বিষয়ে তুমি একেবারে নিশ্চিন্ত থাক। টাকাই নাও আর জমিদারীই নাও এমন রাজার রাজ্য নয় এখানে মানুষ বিক্রী হবার জোটি নেই। টাকায় সিন্ধুক বোঝাই কর, অথচ মেয়ের বাপের একটী কথা বলবার জো নেই। বুঝলে গিন্নি এদেশে মানুষ বিক্রী হয় না। আর তা ছাড়া যদি বাপ মা দু'জনেই মেয়ে দেখতে সুরু করে তা হ'লে ছেলের বাঁচা দায় হয়ে দাঁড়ায়। তুমি মাস খানেক চুপ করে শুধু বসে দেখ, আমি এক রাশ টাকা, লাল টুকটুকে বৌ, প্রকাণ্ড শ্বশুর বাড়ী—এ যদি

না তোমার ছেলের করে দিতে পারি তখন তুমি যা হয় ক'রো। এ আখেরের সময় গরীবের সঙ্গে ছেলের বিয়ে! পঞ্চাশ হাজারটি টাকা লোকসান।"

পরেশ নাথের আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, শ্যামা-সুন্দরীর স্বামীর কথার উত্তর দিবার অবসর হইল না, তিনি তাড়াতাড়ি পুত্রের দুগ্ধ আনিবার জন্য রন্ধন গৃহের দিকে উঠিয়া গেলেন। শম্ভুনাথবাবুও উপরে যাইবার জন্য ফিরিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সিঁড়ির দিকে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিলেন; পরেশ নাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বুঝলে বাপু এই কলকাতা সহরটা বড় সাংঘাতিক যায়গা। এখানকার রাস্তায় চলা বড় শক্ত, একটু উনিশ বিশ হয়েছ কি গেছ। তোমার ও দয়া মায়া দুর্ব্বলতা গুলো ছাড়। এখানে বেশী দয়া মায়া দেখালে কি আর রক্ষে আছে, শঙ্গপালের মত একেবারে ছেকে ধরবে। দু'দিনে পথে বসতে হবে। চখের পর্দ্দা ছোট কর বাপু, চখের পর্দ্দা ছোট কর। গু'নের ছোটলোক না হতে পারলে কমলার কৃপা পাওয়া যায় না। সেই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এত ছোট লোক ছিলেন। নিজের বংশ নিজে ধ্বংশ করেও ক্ষ্যান্ত হননি।" আমাদের ঠাকুর হ'লেন বাঁকা, কাজেই আমাদের চলতে হবে বাঁকা, বলতে হবে বাঁকা নইলে কি আর রক্ষে আছে।

পরেশনাথ কোন কথা কহিল না, অবনত মস্তকে থালার অন্ন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্যঞ্জন নাড়িতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী দুগ্ধের বাটী লইয়া উপস্থিত হইলেন। শম্ভুনাথবাবু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিলেন, পত্নীকে আসিতে দেখিয়া ঘাড়টা ফিরাইয়া বলিলেন, "দেখ তোমার ছেলেটির প্রাণ বড় দুর্ব্বল। ধীরে সুস্থে বেশ করে বুঝিয়ে দিও যে এ দুর্ব্বলতার কাল নয়,—একটু সুবিধে পেয়েছে কি অমনি দশ ব্যাটায় সব ঠকিয়ে নেবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরেশনাথ টাকা দিবে বলায় সেই দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রটির সহিত কনকের বিবাহ হইল না। কনকের স্থির ধীর শান্ত মূর্ত্তিটি যৌবনের বাতাসে ফুটিয়া উঠিতেছিল। যৌবন রঙ্গের তুলি ধরিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে নূতন সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া দেহের খুঁতগুলি একেবারে নিখুঁত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া পত্নী অভাবগ্রস্থ সেই দ্বিতীয়পক্ষের পাত্রটীর একেবারে মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সে কনককে বিবাহ করিবার জন্য মহিমবাবুকে মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিল,—অর্থ নেওয়া দূরের কথা সে মহিমবাবুকে মোটা রকম কিছু অর্থ দিবে এ কথাও জানাইতে ছাড়িল না ; কিন্তু মহিমবাবু রাজি হইতে পারিলেন না, যাহার অভাবে তিনি সেই স্থবির বৃদ্ধের হস্তে প্রাণসমা দুহিতাকে সমর্পন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, পরেশনাথ যখন সেই অভাবই মিটাইতে প্রস্তুত তখন তিনি কোন প্রাণে সেই বৃদ্ধের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবেন! উপায় থাকিতে ইচ্ছা করিয়া কেহ কি কখনও নিজের কন্যাকে বলি দিতে পারে! যাহা নয় তাহা কেমন করিয়া হইবে! মহিমবাবু কনকের একটী সুপাত্রের জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাস সমস্ত দিন গুমোট করিয়াছিল। সন্ধ্যার পর হইতে ঠাণ্ডা বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। আনন্দময়ী একখানি মাদুর পাতিয়া কন্যা তিনটিকে লইয়া ছাদের উপর বসিয়াছিলেন। হর্ম্মশিখর পরিবেষ্ঠিত কলিকাতা মহানগরীর উপর অর্দ্ধ পরিপূর্ণ চন্দ্রের মায়ামন্ত্র ঘুমন্ত শিশুর অপরূপ হাসির মত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশের গায়ে নক্ষত্রমণ্ডলী মিট মিট জ্বলিয়া চাঁদের শোভায় নিজেদের শোভা বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। স্নেহ চাঁদের দিকে চাহিয়া ছিল,—চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার কত কথাই মনে পড়িতেছিল। গত জীবনের কত সুখ, কত আনন্দ, কত ভালবাসাবাসি বিধাতার অভিসম্পাতে এক দিনে সব শেষ হইয়া গেল কেন! সে কি অপরাধ করিয়াছে! কই সেতো জ্ঞানতো কোন পাপ করে নাই। তবে কেন বিধাতা তাহার উপর এই নিষ্ঠুর দণ্ডের বিধান করিলেন। স্নেহের নয়নে অশ্রু উচ্ছলিয়া উঠিল; সে যেন দেখিল চাঁদের ভিতর হইতে তাহার স্বামী উকি দিতেছেন, তাঁহার মধুরস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "স্নেহ দুঃখ করিও না। ভগবান মঙ্গলময় তিনি যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করেন। তিনি যাহার যে অবস্থাই ব্যবস্থা করুন তাহাতেই তাহার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তোমার কর্ম্মফল শেষ হইলেই তুমি আবার আমার কাছে আসিবে। আবার তোমাতে আমাতে মিলন হইবে, সে মিলনে

বিচ্ছেদ নাই, দুঃখ নাই, অভাব নাই, আছে কেবল অসীম অনন্ত আনন্দ।"

স্নেহের প্রাণের বোঝা যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল, সে ধীরে ধীরে অঞ্চলে চক্ষু জল মুছিল। আনন্দময়ী কন্যাকে অশ্রুজল মুছিতে দেখিয়া, তাঁহার প্রাণ কন্যার দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। জামাতার কথা স্মরণ হইবা মাত্র তাঁহারও নয়নে কন্যার অশ্রু সংক্রামক হইবার মত হইল। তিনি প্রাণের বেদনা প্রাণে চাপিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নেহ কাঁদ-ছিস্! ছি মা কাঁদতে আছে,—বাঙ্গালির মেয়ের যে সহ্য করবার জন্যই জন্ম। দেখতে পাস্নি আমি কত সহ্য করি।"

স্নেহ তখন নিজেকে অনেকটা সাম্লাইয়া লইয়াছিল ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "কই না মা আমি তো কাঁদিনি।"

স্বর্ণ দিদির পাশটিতে বসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁ মা দিদি কাঁদছে, ওই যে দিদির চোখে জল।"

স্নেহ কোন কথা কহিল না, কথা কহিলে চোখের জল পাছে আবার প্রবল হইয়া উঠে সেই ভয়ে সে নীরবে অবনত মস্তকে কাপড়ের পাড় খুঁটিতে লাগিল। আনন্দময়ী বলিলেন, "নে কাঁদিস্নি। বরাতে যা ছিল তাতো কেউ খণ্ডাতে পারে না। মরা বাঁচা তো আর মানুষের হাত নয় কেঁদে কি করবি বল! মেয়ে মানুষের স্বামীই দেবতা, দিনরাত দেবতার মত করে তার

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূজো কর, দেখবি প্রাণের কোন কষ্ট থাক্‌বে না। স্বামী কি কারুর মরেরে; স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে স্বামীর আত্মা যে এক হয়ে যায়। তিনি তাঁর দেহ ছেড়ে চলে গেলেও যে, স্বামীর আত্মা স্ত্রীর দিন রাত পাশে পাশে থাকে।"

জননীর কথাগুলি স্নেহের প্রাণের ভিতর গাঁথিয়া যাইতেছিল। সে কথাটা চাপা দিবার জন্য মস্তকটি তুলিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "হা মা পরেশবাবু স্বর্ণকে যে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, তা নিয়ে গেলেন না?"

মানুষ সব ছাড়িতে পারে কিন্তু আশা ছাড়িতে পারে না। কুহকিনী আশা পৃথিবীতে না থাকিলে মানুষ এক দিনও জীবিত থাকিতে পারিত না। হইবে না,—হইতে পারে না, হওয়া একেবারেই অসম্ভব এ কথাটা জানিয়াও আনন্দময়ী একেবারে পরেশের আশা ছাড়িতে পারেন নাই। তখনও কুহকিনী আশা আনন্দময়ীর কর্ণে নানা আশার কথা কহিয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে একটা ক্ষীণ আলো ধরিয়াছিল। স্নেহের মুখে পরেশনাথের নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র তাঁহার সমস্ত প্রাণটা যেন একবার দুলিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "কাল নিয়ে যাবে বলেছে,—তার মা একবার স্বর্ণকে দেখতে চেয়েছেন। আহা অমন ছেলে কি হয়! আজ কালকার দিনে নিজের লোকে কেউ এক পয়সা দেয় না সে

কনকের বিয়ের সমস্ত খরচা দেবে বলেছে। কনকের জন্য উনি একটি পাত্র দেখতে গেছেন যদি পাত্রটি পছন্দ হয় তাহ'লে তারই সঙ্গে কনকের বিয়ে হবে।"

স্নেহ ধীর স্বরে বলিল, "মা স্বর্ণের সঙ্গে যদি পরেশবাবুর বিয়ে হয়তো বেশ ভালো হয়। পরেশবাবু স্বর্ণকে বড় ভালবাসেন।"

স্বর্ণের মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যের লজ্জা চারি পার্শ্ব হইতে আসিয়া তাঁহাকে যেন একেবারে মাটিতে মিশাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, সে দিদির কোলে মুখ লুকাইল। আনন্দময়ী বলিলেন, "আমার কি এমন বরাৎ হবে যে, স্বর্ণের সঙ্গে পরেশনাথের বিয়ে হবে। জন্ম জন্মান্তর কত তপস্যা কল্লে তবে অমন জামাই হয়। আমার যে মন্দ বরাৎ সে আশা একদিনের জন্যও করিনি, তবে যদি হয় সে স্বর্ণের অদৃষ্টে।"

আনন্দময়ী নীরব হইলেন। স্নেহ আর কোন কথা কহিল না। নিস্তব্ধ ছাদে কেবল স্নিগ্ধ বাতাস ঝির ঝির করিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় চারটি প্রাণীর সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। ঊর্দ্ধে নীলাকাশে সাদা সাদা মেঘ বাতাসের আঘাতে ভাসিয়া আসিয়া মাঝে মাঝে চাঁদের হাসি ম্লান করিয়া যেন বলিয়া দিতে লাগিল, সুখ দুঃখ হাসি কান্নার ভিতর দিয়া জগৎ ঠিক এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, হাসির পর কান্না, কান্নার পর হাসি ইহাই জগতের রীতি, বিধা-

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তার নিয়ম। রাত্রের পর যেমন দিন, অন্ধকারের পর যেমন আলো,—দুঃখের পর সেইরূপ সুখ না থাকিলে পৃথিবী একদিনও চলিতে পারিত না,—চলা অসম্ভব হইত। এই সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, ভাঙ্গা গড়ার উপরই জগতের স্থিতি ও বৃদ্ধি। সহসা সেই স্তব্ধ নিস্তব্ধতাকে বিচলিত করিয়া স্বর্ণ বলিয়া উঠিল, "মা ওই বাবা এসেছেন।"

মহিমবাবুর কণ্ঠস্বর আনন্দময়ীরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। মহিমবাবু কনকের জন্য পাত্র দেখিতে গিয়াছিলেন, সেখানে কি হইল না হইল জানিবার জন্য আনন্দময়ীও বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন; স্বামীর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বর্ণের কথার উত্তরে বলিলেন, "চল শুনিগে যাই কি হ'লো।"

স্বর্ণ মাতার সহিত পিতার নিকট যাইবার জন্য উঠিতেছিল কিন্তু তাহার আর উঠিতে হইল না, মহিমবাবু ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নীচে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উপরে আসিয়াছিলেন। অর্দ্ধ পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় ছাদের অন্ধকার সরিয়া গিয়াছিল। আনন্দময়ীর দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর পতিত হইল। বহুদিন পরে আজ আবার একটা আনন্দের রেখা মহিমবাবুর মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বহু দিন পরে স্বামীর মুখে চোখে আনন্দের রেখা দেখিয়া আনন্দময়ীর প্রাণ এক মহানন্দে

পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখলে, পাত্রটি পছন্দ হ'লো? কথাবার্ত্তা কিছু স্থির হ'লো?"

মহিমবাবু আসিয়া সেই মাদুরের এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তিনি গলা হইতে উত্তরীয়খানা নামাইয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কথাবার্ত্তা এক রকম পাকাই হয়ে গেল, হাজার টাকা নগদ, দেড়হাজার টাকার গহনা। বরযাত্র খাওনা, ফুলশয্যা প্রভৃতি নিয়ে প্রায় তিন হাজার টাকাই পড়বে। আস্‌ছে সোমবার তারা মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। এদিকে সব ভালো, ছেলে বি, এ, পড়ছে, একটু যা খুঁত মা বাপ নেই। বিধবা পিসিই হ'লেন বাড়ীর গিন্নি। কলকাতায় নিজের বাড়ী ঘর দোর,—মোটের উপর মন্দ নয়।"

কোথায় কন্যাকে এক স্থবির বৃদ্ধের হস্তে সমার্পণ করিতে যাইতেছিলেন, আর কোথায় বি, এ, পড়া ছেলে। স্বর্গে মর্ত্তে প্রভেদ বলিলেই হয়। স্বামীর কথায় আনন্দময়ী প্রাণের আনন্দ আর বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না, তাহা একেবারে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। মহিমবাবু নীরব হইবা মাত্র তিনি আবার তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সব বিষয় খুঁটিয়ে দেখ্‌তে গেলে কি আর চলে? যাই'ক্ ছেলেটি কেমন দেখ্‌তে শুনতে?"

মহিমবাবু উত্তরীখানা একবার নাড়িয়া বলিলেন, "ছেলে

দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ, তবে যেন একটু খরখরে বলে বোধ হয়। তা আজকালকার ছেলেরা প্রায় ওই রকমই হয়ে থাকে। তার আর অপরাধ কি! ইংরেজি শিক্ষার দোষই হচ্ছে ওই, যেন কেমন নম্রতা থাকে না। সে সব ভাববার কিছু নেই বয়স হ'লেই ওগুলো শুধ্‌রে যাবে। মেয়ে গিন্নি এই যা ভাবনা। তা আর কি করবো বল, পাত্রের যা বাজার সব দিক খুটিয়ে দেখে দিতে গেলে দশটি হাজার টাকার কমে আর কিছুতেই হয় না। পরেশনাথ তো বলেছে ভাল পাত্র দেখুন যা খরজ হয় আমি দেব, কিন্তু তা বলেতো আমাদেরও একটা বিবেচনা কর্ত্তে হবে। এই তিন হাজার টাকাই আজকালকার বাজারে কে কাকে দেয় বল না।"

আনন্দময়ী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তাতো বটেই, তা হ'লে আর খুঁতমুত করে কাজ নেই। ওইখানেই একেবারে পাকা করে ফেল। বিয়ে হ'লো ভবিতব্য ও যার সঙ্গে যার হবার হবে তার সঙ্গে তার ঠিকই হবে। বাপ মার কাজ দেখে শুনে দেওয়া তাই দেখে শুনে দিতে হয়। আচ্ছা হাঁগা ইংরিজি শেখার দোষ বল্‌ছো, কিন্তু আমাদের পরেশওতো বি, এ, পড়্‌ছে, কিন্তু কেমন নম্র বল দেখি।"

মহিমবাবু পত্নীকে বাধা দিয়া বলিলেন, "পরেশের কথা ছেড়ে দাও। আজ কালকার দিনে হাজারে একটাও অমন ছেলে মেলে কিনা সন্দেহ। পরেশের মত পাত্রের দর কি জান, পঞ্চাশ হাজার

টাকা, তাহাও পড়তে পায় না। পরেশনাথের সন্ধ্যের পর আসবার কথা ছিল, এখন এলো না কেন তাই ভাবছি। টাকাটা হাতে না এলেতো আর একেবারে পাকা কথা দিতে পারি নি!”

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, “সে যখন বলেছে তখন সে নিশ্চয়ই দেবে, সে জন্যে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আহা অমন ছেলে হয় না; পরের দুঃখে যার প্রাণ কাঁদে ভগবান তার ভালো করেন।”

মহিমবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, “তা জানি, আর তা জানি বলেই তার একটা কথার ওপর নির্ভর করে আমি তাদের এক-রকম পাকা কথাই দিয়ে এলুম। তবে কি জান টাকাটা যদি পরেশনাথের নিজের কাছে থাকতো তাহ’লে কোন কথাই ছিল না। টাকাটা তার মার কাছ থেকে চেয়ে দিতে হবে, সেইজন্যেই একটু ভাবনা। তার মা কেমন লোক তাতো আমরা জানিনি, যদি তিনি টাকাটা না দিতে—”

আনন্দময়ী তাঁহার স্বামীকে কথাটা শেষ করিতে দিলেন না; তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “তাকি কখন হয়; তার মার কথা না যেনে কি সে এতবড় একটা কথা দিতে পারে? তা ছাড়া মা যদি ভালো না হয় তা হ’লে কখন কি অমন ছেলে হয়?”

বাহিরের দ্বারে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজার কড়া ঝনঝন করিয়া নড়িয়া উঠিল। আনন্দময়ী বলিলেন,

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"ওই পরেশনাথ এসেছে,—যা স্বর্ণ দরজাটা খুলে দিয়ে আয়গে।"

স্বর্ণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; মহিমবাবু বলিলেন, "ওপরেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়, যে গরম নীচের ঘরে বসা যাবে না।"

স্বর্ণ যাইয়া সদর দরজা খুলিয়া দিল, পরেশনাথ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখে স্বর্ণকে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা পাত্র দেখে ফিরেছেন?"

স্বর্ণ কেবল একটী ক্ষুদ্র হাঁ বলিল। পরেশনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "এইবার তোমার পালা। তোমার একটা বিহিত কর্ত্তে পারলেই নিশ্চিন্তি।"

স্বর্ণের মুখে কে যেন একরাশ আবীর ছড়াইয়া দিল। সে একবার পরেশনাথের দিকে ঘাড়টা বাঁকাইয়া একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যাও।"

পরেশনাথ উত্তর দিল, "যাও বল্লে তো আর হচ্ছে না,— একটা যাহ'ক্ জোড়া গাঁথাতো করে দিতেই হবে।"

স্বর্ণ কথা কহিল না, ঠোট দুইটা ঈষৎ ফুলাইয়া হন হন করিয়া অগ্রসর হইল। পরেশনাথও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া একেবারে ছাদে উপস্থিত হইলেন। মহিমবাবু বলিলেন, "এস বাবা, এস, বোস!"

পরেশনাথ ধীরে ধীরে যাইয়া মাদুরের একপার্শ্বে অবনত মস্তকে বসিল। মহিমবাবু বলিতে লাগিলেন, "পাত্রতো বাবা দেখে এলুম,

মোটের ওপর মন্দ নয়। হাজার টাকা নগদ, দেড় হাজার টাকার গহনা দিতে হবে। আর বরযাত্র খাওনা, ফুলশয্যে প্রভৃতিতেও আরো পাঁচশো টাকা খরচ। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হবে।”

পরেশনাথ মাথা না তুলিয়াই উত্তর দিল, “তা হ’লে, কথাবার্ত্তা একেবারে পাকা করে ফেলুন। আমি মার কাছ থেকে চেয়ে টাকাটা কালই আপনাকে এনে দেব।”

মহিমবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পরেশনাথ অতি মৃদুস্বরে আবার বলিলেন, “মা একবার স্বর্ণকে দেখ্‌তে চেয়েছেন। আপনি যদি বলেন তা হ’লে আমি কাল স্বর্ণকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাই।”

মহিমবাবু মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “সে কি কথা বাবা, তুমি স্বর্ণকে নিয়ে যাবে তার আবার জিজ্ঞাসা করবার কি আছে! যখন ইচ্ছে তুমি তাকে নিয়ে যাবে। তোমার মা স্বর্ণকে দেখ্‌তে চেয়েছেন, এর চেয়ে আর আমার অধিক আনন্দ কি হতে পারে?”

পরেশনাথ কোন উত্তর দিল না, হেটমুণ্ডে মাদুরের কাটিগুলি খুঁটিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আজ মধ্যাহ্নে স্বর্ণ পরেশনাথের বাড়ী যাইবে। প্রভাত হইবা মাত্র স্নেহ স্বর্ণকে লইয়া পড়িল! রূপের প্রতিদ্বন্দিতায় স্বর্ণ যদি পরেশনাথের মাতার নিকট জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে হয়তো সে একদিন শম্ভুনাথবাবুর গৃহে বধূরূপে আশ্রয় পাইলেও পাইতে পারে! স্বর্ণের রূপের অভাব ছিল না, বিধাতা সৌন্দর্য্যের তুলি ধরিয়া স্বহস্তে রংটুকু ফলাইয়া তাহার মুখ চোখ আঁকিয়া দিয়া ছিলেন; কিন্তু সে রূপ যে রূপের রাজ্যে প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হইতে পারিবে তাহাতে নিশ্চয়তা কি! স্নেহ স্বর্ণকে ধরিয়া লইয়া কল্‌তলায় ফেলিয়া সাবান ও ঘস্‌ড়ায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল মাজিয়া ঘসিয়া সেই রূপের যতদূর সম্ভব চটক বাড়াইয়া তুলিল। তাহার পর উপরে লইয়া যাইয়া একঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিয়া তাহার এক অপরূপ সুন্দর কবোরী বাঁধিয়া দিল। কবোরী বন্ধন শেষ হইলে একখানি সদ্য ধৌত কাপড় আনিয়া তাহাকে পরাইল, —কপালে একখানি কাচ্‌পোকার টিপ দিতেও তাহার ভুল হইল না। যেখানে যেটুকু দিলে রূপের জ্যোতি উজ্জ্বল হইয়া উঠে সে বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্বর্ণের সেখানে সেটুকু দিতে ভুলিল

না। তাহার পর সে স্বর্ণকে একখানি দর্পণের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিল, "দেখদেখি কেমন মানিয়েছে, এরূপ যদি পরেশ-বাবুর মার চোখে না লাগে তাহ'লে তার কোনরূপই চোখে ধরবে না।"

বেশ বিন্যাসের সুদৃঢ় বন্ধনের ভিতর পড়িয়া একেই স্বর্ণ লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল,—দিদির কথায় লজ্জায় তাহার মুখখানি একেবারে নত হইয়া পড়িল। তাহার ঠোঁট দুইখানি ফুলিয়া উঠিল, সে কোনক্রমে লাজ বিজড়িত-নয়নে একবার মাত্র দিদির দিকে চাহিয়া বলিল, "যাও দিদি তোমার ওই এক কথা।"

স্বর্ণের প্রাণে আজ কিসের লহর খেলিতে ছিল, কথার ভাবে স্নেহের নিকট তাহা অবিদিত রহিল না। স্নেহ মৃদু হাসিয়া বলিল, "এইবার মার কাছে চ', দেখিয়ে আনি সাজিয়ে গুজিয়ে কেমন দেখ্‌তে হয়েছে।"

স্বর্ণ দিদির কথার উত্তরে, "না আমি যাব না" বোধ হয় বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার সে কথা কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না, গৃহের ভিতর জননীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে চুপ করিল। স্নেহ জননীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখ মা স্বর্ণকে কেমন দেখ্‌তে হয়েছে?"

আনন্দময়ী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার স্বর্ণের আপাদমস্তক দেখিয়া অতি মধুস্বরে বলিলেন, "বা বেশ দেখতে হয়েছে। তুই বুঝি

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকাল থেকে এই কচ্ছিস্। সাজিয়ে গুজিয়ে তুই যে স্বর্ণকে আজ একেবারে বিয়ের ক'নেটি করে তুলেছিস্।"

স্বর্ণ ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া বলিল, দেখনা মা দিদি যেন আমাকে কি পেয়েছে।"

স্নেহ মৃদুস্বরে বলিল, "কি পেয়েছি কিরে,—এত করে সাজিয়ে গুজিয়ে দিলুম এতেও যদি পরেশবাবুর মার মন ভোলাতে পারিস্ তখন মুখ নাড়িস্। রূপের বাজারে যদি জয়ী হ'তে পারিস্ তবেই আমার সাজান সার্থক।"

মহিমবাবুর মধ্যম কন্যা কনক আসিয়া সংবাদ দিল, "মা পরেশ-বাবু এসেছেন।"

আনন্দময়ী ব্যস্তভাবে বলিলেন, "পরেশনাথ এসেছে! ওপরে ডেকে নিয়ে আয়।"

মহিমবাবুর মধ্যম কন্যা কনকের স্বভাব ছিল অতি কোমল। তাহার মুখে কথা ছিল না বলিলেই হয়। সে নিজের মনে নিজের কাজ করিয়া যাইত খুব বেশী প্রয়োজন না হইলে সে আর বড় একটা কথা কহিত না। জননীর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই কনক আবার পরেশনাথকে ডাকিবার জন্য ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। পরেশনাথ আসিয়াছে এই সংবাদটুকুতে স্বর্ণের প্রাণে আজ একটা লজ্জার হিল্লোল বহিয়া গেল। আনন্দ-ময়ী গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিলেন ঠিক সেই সময় কনকের

পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরেশনাথ সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দময়ী গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "এস বাবা এস, এতক্ষণ তোমারই কথা হচ্ছিল। স্বর্ণ আজ তোমাদের বাড়ী যাবে বলে স্নেহ তো তাকে সকাল থেকে মেজেঘোসে একেবারে চক্‌চকে করে তুলেছে।"

স্বর্ণ গৃহের এক পার্শ্বে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, স্নেহ তাহার হাত ধরিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, "অমন কোনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? এগিয়ে আয়, পরেশবাবু দেখুক কেমন সেজেগুজে দেখতে হয়েছে।"

স্বর্ণ দিদির হস্ত হইতে নিজের হস্তখানি মুক্ত করিবার জন্য ঈষৎ টান দিয়া বলিল, "যাও দিদি তুমি বড় দুষ্ট।"

স্নেহ যেন বেশ একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, "আহা মেয়ের লজ্জা দেখে আর বাঁচিনি। এদিকে পরেশবাবু একদিন না এলে তো রক্ষে নেই। কেন এলেন না দিদি, কেন এলেন না দিদি শুন্‌তে শুন্‌তে তো কাণ ঝালাপালা হয়ে যায়।"

স্বর্ণ একটী তীব্রদৃষ্টিতে দিদির দিকে চাহিয়া, হন্ হন্ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে দৃষ্টি পরেশনাথের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যেন একেবারে মায়ারাজ্যে ফেলিয়া দিল। স্বর্ণের নয়নের ভঙ্গিমাটুকু পর্য্যন্ত আজ যেন পরেশনাথের একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ঠেকিল। আনন্দময়ী পরেশনাথকে দাঁড়াইয়া

থাকিতে দেখিয়া আবার বলিলেন, "কেন বাবা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ওই খাটের উপর গিয়ে বোস।"

আনন্দময়ীর স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র পরেশনাথ যেন স্বপ্নরাজ্য হইতে মরজগতে আসিয়া পড়িল; তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে আনন্দময়ীর কথায় তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "না মা আজ আর আমি বোসবো না,—স্বর্ণকে একটু বেলাবেলী নিয়ে যেতে চাই। আবার রাত্রিতে তো তাকে রেখে যেতে হবে।"

আনন্দময়ী অবগুণ্ঠনটা একটু টানিয়া বলিলেন, "তা হক্, একটু বোস। ওনি ঘরের ভেতর শুয়ে আছেন, ওর সঙ্গে একবার দেখা করে যাও। নাও একটু বোস বাবা আমি এখনি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি।"

পরেশনাথকে অগত্যা বাধ্য হইয়া খাটের একপার্শ্বে যাইয়া বসিতে হইল। আনন্দময়ী মহিমবাবুকে ডাকিয়া দিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পরেশনাথ স্নেহের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কেমন আছ, এখন শরীরটা একটু ভালো বলে মনে হয়।"

স্নেহ মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ—"

পরেশনাথ আসিয়াছে সংবাদ পাইবা মাত্র মহিমবাবু তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে

দেখিয়া পরেশনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি হাতটা নাড়িয়া বলিলেন, "বোস বাবা বোস। স্বর্ণ ছেলে মানুষ যদি তোমাদের বাড়ী গিয়ে কোন অসভ্যতা করে, তোমার মাকে তার দোষ অপরাধ গুলো ঢেকে নিতে হ'লো। এখনতো ওর জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই হয়নি।"

পরেশনাথ অবনত মস্তকে আবার পালঙ্কের উপর গিয়া বসিল; মহিমবাবু তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। তাহার পর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তারপর সেই কথাটা বলছিলেম, কনকের পাকা দেখা সোমবারই স্থির হ'লো। পাকা দেখাটা হয়ে গেলে যত শিগ্‌গির হয় বিয়ের একটা দিন স্থির করলেই হবে।"

পরেশনাথ মস্তক অবনত করিয়াই উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ, তাই কল্লেই হবে। আমি মাকে বলেছিলুম, টাকাটা আজ রাত্রেই এনে দিয়ে যাব অখন।"

মহিমবাবু শান্তস্বরে বলিলেন, "বাবা তোমার ঋণতো শোধ হবার নয় কি আর বলবো। তা হ'লে আর বেলা ক'রো না।"

তাহার পর স্নেহের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "স্নেহ, স্বর্ণ গেল কোথায়, তাকে ডেকে দাও, সকাল সকাল যাক্।"

পরেশনাথ মহিমবাবু ও আনন্দময়ীর নিকট বিদায় লইয়া স্বর্ণের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী তাহাদের লইয়া ভবানী-

পূরের দিকে রওনা হইল। স্বর্ণ পরেশনাথের সম্মুখে বসিয়াছিল, পরেশনাথের লজ্জিত দৃষ্টি মাঝে মাঝেই স্বর্ণের ঢলঢলে মুখখানির উপর পতিত হইতে লাগিল। গাড়ী মহিমবাবুর বাড়ী পশ্চাতে ফেলিয়া বহুদূর চলিয়া আসিল, কিন্তু কাহার মুখে কোন কথা নাই, উভয়েরই প্রাণ শত চিন্তায় পরিপূর্ণ। পরেশনাথের মনে কত কথাই উদয় হইতে ছিল। স্বর্ণকে দেখিয়া জননী কি বলিবেন; তাহার প্রাণের ভিতর যে ইচ্ছাটা জাগিয়া উঠিয়াছিল, ভগবান কি তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন! জননী কি স্বর্ণকে পছন্দ করিবেন! কিন্তু তাঁহার পছন্দই তো শেষ নয়, যদি জননীর পছন্দ হয়, তিনি কি পিতাকে সম্মত করাইতে পারিবেন। আশা ও নিরাশার সহস্র তুফান তুলিয়া চিন্তা রাক্ষসী তখন পরেশনাথের চক্ষের সম্মুখে যেন ছায়াবাজী দেখাইতে লাগিল। চিন্তার স্রোতটাকে অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য পরেশনাথ স্বর্ণের সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আজ যেন কেমন একটা সাঙ্কোচ আসিয়া সে পথেও নানা বিঘ্ন প্রদান করিতে লাগিল। পরেশনাথ সেই সঙ্কোচের ভাবটাকে কোনক্রমে একটু দূরে সরাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে তোমার একলা যেতে ভয় কচ্ছে না?"

স্বর্ণ গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া কলিকাতা মহানগরীর সারিবন্দি সৌধ শিখর, রাস্তার জনপ্রবাহ, গাড়ী ঘোড়া অবাক হইয়া দেখিতে দেখিতে আসিতেছিল। পরেশনাথের

কথায় সে মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল, "আপনার সঙ্গে যেতে বুঝি আবার ভয় করে !"

কেন ভয় করে না এইটুকু জানিবার জন্য পরেশনাথের সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ভয় করে না, আমি তোমার কে ? আমার সঙ্গে তো তোমাদের মোটে দিন কয়েকের আলাপ মাত্র।"

স্বর্ণ কোন উত্তর দিল না,—পরেশনাথ একটা উত্তরের আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় বলিল, "কেন ভয় করে না, বল্‌বে না ?"

দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিবার পর স্বর্ণ একবার মাত্র মুখখানি ফিরাইয়া বলিল, "ভয় করে না,—ভয় করে না তার আবার কেন কি !"

পরেশনাথ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন নেই, অন্যের সঙ্গে যেতে ভয় করে, আর আমার সঙ্গে যেতে ভয় করে না কেন, তার তো একটা কারণ আছে ?"

স্বর্ণ বঙ্কিমভাবে একবার পরেশনাথের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার সেই ক্ষুদ্র ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া বলিল, "তা জানিনি।"

"তা জানিনি বল্লেতো ছাড়ছিনি,—না তোমায় বল্‌তেই হবে।" পরেশনাথ স্বর্ণের হাত দুইখানি ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৈদ্যুতিক প্রবাহে একটা পুলকস্পন্দনে তাহার সমস্ত দেহটা নড়িয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল যেন পূর্ণানন্দে তাহার সমস্ত প্রাণ আজ কানায় কানায় ভরিয়া গেল। স্বর্ণ কোন উত্তর দিল না, কেবল একবার মাত্র মুখখানি তুলিয়া পরেশনাথের দিকে চাহিল। সেই চকিত দৃষ্টিতে পরেশনাথ যেন সমস্ত উত্তর পাইল। সেই নয়নের নির্ব্বাক ভাষা যেন তাহার অন্তরের গোপন প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সুস্পষ্টস্বরে বলিয়া দিল, "তুমি যে আমার জীবন মরণের দেবতা, তোমার সঙ্গে যাইতে আবার ভয়!"

পরেশনাথ স্বর্ণের মুখের উপর আজ যেন এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিল, সে সৌন্দর্য্যে তাহার প্রাণের সমস্ত অন্ধকার সূর্য্যের আলোকের মত একেবারে পরিস্কার করিয়া দিল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না। সে নীরবে স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়ীর দরজা খোলার শব্দে পরেশনাথের চৈতন্য হইল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া, স্বর্ণের হাতখানি ধরিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। স্বর্ণ পরেশনাথের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। শম্ভুনাথবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী, মূল্যবান আসবাবপত্র দেখিয়া স্বর্ণ একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে এত মূল্যবান জিনিষপত্রে সজ্জিত এতবড় প্রকাণ্ড বাড়ী জীবনে আর কখনও দেখে নাই।

পরেশনাথ জননীর গৃহের দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মা আমি সেই মেয়েটীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।"

শ্যামাসুন্দরী গৃহের মেঝের উপর বসিয়া ঢুলিতে ছিলেন, পুত্রের স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; অতি কোমল স্বরে বলিলেন, "কই কাকে নিয়ে এলি, দেখি ভেতরে নিয়ে আয়।"

স্বর্ণ পরেশনাথের সহিত তাহার জননীর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। শ্যামাসুন্দরী স্বর্ণকে দেখিয়া বলিলেন, "বা দিব্বি মেয়েটিতো, এস মা এস।"

লজ্জায় স্বর্ণের সমস্ত মুখখানিতে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে যাইয়া শ্যামাসুন্দরীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

সুবাসিত তাম্রকূটের সৌগন্ধে সমস্ত ঘরখানা একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। শম্ভুনাথবাবু দিবা নিদ্রা শেষ করিয়া সবে মাত্র চক্ষু মেলিয়াছিলেন,—এখন তিনি শয্যাত্যাগ করেন নাই,—শয্যায় পড়িয়া গুড়গুড়ির নলটায় মৃদু মৃদু টান দিয়া, মন্দ মন্দ ধোয়া ছাড়িয়া নিদ্রার জড়তাটাকে মারিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। কিন্তু তাহাতে জড়তা মরিবার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, বরং তাম্রকূটের ধোয়া লাগিয়া তাহা যেন আরও জমাট বাঁধিয়া চক্ষু পল্লব জড়াইয়া ধরিতেছিল। সেই আধ ঘুম আধ জাগরণের মাঝখানে পড়িয়া পড়িয়া তিনি কি করিলে ক্রমাগত টাকার আমদানী হয় তাহারই সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণটা কখন বা আনন্দে হাসিয়া উঠিতেছিল, কখনও বা বিষাদে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিল। সেই সময় শ্যামাসুন্দরী স্বর্ণের হাত ধরিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শম্ভুনাথবাবু চক্ষু মুদিয়াছিলেন, শ্যামাসুন্দরীর গৃহ প্রবেশ জানিতে পারেন নাই, পত্নীর "ওগো শুনছ শব্দে," তিনি চক্ষু মেলিয়া পাশ ফিরিলেন। চক্ষু মেলিবামাত্র তাঁহার দৃষ্টি

পত্নীর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা স্বর্ণের উপর পতিত হইল। সজ্জিত লজ্জিত টুকটুকে একটী বালিকাকে পত্নীর সহিত দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিতে মুছিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখদেখি কেমন মেয়েটি,—আচ্ছা খাসা মেয়ে যেমন রং তেমনি মুখশ্রী। মেয়েটিকে ভারি আমার পছন্দ হ'য়েছে। ভারি শান্ত।"

স্বর্ণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল। শম্ভুনাথবাবুর তীব্রদৃষ্টি তাহার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করিতেছিল। স্বর্ণ সত্যই সুন্দরী ছিল, তাহাকে দেখিলে অপছন্দ করিবার মত কাহার কিছুই ছিল না। তাহার উপর আজ আবার স্নেহ তাহাকে সাজাইয়া দিয়াছে। কাজেই শম্ভুনাথবাবু তাহাকে অপছন্দ করিতে পারিলেন না। একটা হাই তুলিয়া দুইটা তুড়ি দিয়া পত্নীর কথার উত্তরে বলিলেন, "মেয়েটি তো দেখছি খাসা, তার পরের কথাটা কি? কি মতলব এখন বল দেখি? মেয়েটি খাসা বল্লেইতো আর কথার শেষ হ'লো না।"

স্বামীর মুখে মেয়েটিতো 'দেখছি খাসা' শুনিয়া শ্যামাসুন্দরীর যেন প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। তিনি যে কথাটা স্বামীকে বলিতে আসিয়াছিলেন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহারই কেবল সূচনা করিয়াছিলেন। শম্ভুনাথবাবু নীরব হইবা মাত্র তিনি

নবম পরিচ্ছেদ

একেবারে আসল কথা পাড়িলেন। স্বর্ণের চিবুক ধরিয়া তাহার মুখখানি স্বামীর দিকে তুলিয়া বলিলেন, "সত্যিই এমন মেয়ে হাজারে একটীও মেলে না। যাও তো মা ওকে প্রণাম কর।"

লজ্জায় স্বর্ণের পা উঠিতেছিল না, তাহার বুকের ভিতরটা দরদর করিয়া কাঁপিতে ছিল। সে কোনক্রমে পালঙ্কের নিকট যাইয়া শম্ভুনাথবাবুর পদধূলি লইবার জন্য মস্তক অবনত করিয়া হস্ত বাড়াইল। শম্ভুনাথবাবু হাত নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওই হয়েছে,—ওই হয়েছে, থাক থাক।"

স্বর্ণ সেই পালঙ্কের উপর মাথাটা ঠেকাইয়া সেই খানেই নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল। লজ্জায় তাহার চক্ষু দুইটির পল্লব একেবারে মুদিয়া আসিতেছিল। শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "এই মেয়েটির সঙ্গে পচুর বিয়ে দিলে হয় না?"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ! ওরে কে আছিস্, কল্কেটা বদ্‌লে দিয়ে যা।"

শ্যামাসুন্দরী স্বামীর একটা পরিস্কার কথা শুনিবার জন্য কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌ছো বল! এমন মেয়ে না হ'লে কখন বৌ করা যায়। বৌ করতে গেলে এমনি বৌ করাই উচিত, দশজনকে দেখিয়েও সুখ নিজেরও সুখ।"

ভৃত্য আসিয়া দগ্ধ কলিকাটা বদলাইয়া দিয়া গেল। শম্ভুনাথ-

বাবু গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে কয়েকটা বৃথা টান দিয়া বলিলেন, "বৌ করাটা কি জান, ওটা একেবারে পছন্দ অপছন্দের বাহিরে গিয়ে পড়ছে, কেন না ওর ভেতর একটা মস্ত টাকার কথা রয়েছে। টাকার রূপের মত কি আর কিছুর রূপ আছে। তার রূপের কাছে মা ভগবতীর রূপও হার মেনে যায়। কাজেই ও রূপ টুপ কিছু বুঝি না! রূপের ওজনে যদি টাকা দেয়, তাহ'লে রূপের দরকার কি। সোনা দিয়ে ছাই রূপ ঢেকে ফেল না কেন।"

স্বামীর কথায় শ্যামাসুন্দরীর মুখখানি ভার হইয়া উঠিল, তিনি বেশ একটু করুণ স্বরে বলিলেন, "না বাপু, আমি একটা কালো কুৎসিত মেয়ে বৌ করতে পারবো না। আমার সাত নয়, পাঁচ নয় একটা ছেলে আমার টাকার দরকার কি, বৌটি ভালো হ'লেই হ'লো।"

শম্ভুনাথবাবু পত্নীকে বাধা দিলেন, গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সেই সাত নয়, পাঁচ নয় বলেইতো আরো সুবিধে। শম্ভুনাথ ঘোষের একমাত্র ছেলে, তার আজকালের বাজারে দরটা কি জান? এ চালের দর রোজই ওটা নাবা কচ্ছে, একটু বেহিসেবী হয়েছ কি লোকসান। কিন্তু ছেলের দর নামতে জানে না কেবলই চড়ছে। এই চড়ার বাজারে কেন না পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্‌করে ঘরে উঠ্‌বে। এ বাজারে কি আর পছন্দ অপছন্দ চলে। টাকার

নবম পরিচ্ছেদ

ঝুনঝুন আওয়াজে সব পছন্দ এক কথায় ওলোটপালোট হয়ে যায়। পছন্দ অপছন্দ ওসব গৃহস্থদের চলে, ওসব বাজে জিনিষ দেখ্‌তে গেলে বড়লোক হওয়া যায় না।"

শ্যামাসুন্দরী মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "অমন বড়লোকে আমার কাজ নেই, ছেলের বিয়ে দিয়ে মনের মত বৌ ঘরে আনবো না তাতেও টাকা! তোমার ওই এক কথা।"

তাম্রকূট বেশ ধরিয়া উঠিয়াছিল,—শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলে কয়েকটা মৃদু টান দিবার পর একটা সুখটান দিয়া কতকটা ধূম ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "বড়লোকে কাজ নেই বল্লেইতো আর গরীব হওয়া যায় না। যখন বড়লোক হয়েছ তখন বড়লোকের কায়দা করণগুলো রাখ্‌তেই হবে। আমার বাবা আমার বিয়েতে তোমার বাবার কাছ থেকে তখনকার সেই ঢিমে বাজারে বারটি হাজার টাকা নিয়েছিলেন। আর এই চড়ার বাজারে আমি আমার ছেলের বিয়েতে পঞ্চাশ হাজার চাচ্ছি এটা কি এমন কিছু বেশী হ'লো। বাবা যা রেখে গেছিলেন, তার এখন চারগুণ টাকা হয়েছে। এর ওপরেও আবার কথা। সে যাক্ এখন মেয়েটি কার, এর বাবা কত টাকা দিতে পারে, এটিকে তুমি কোথা থেকে আনলে একে একে বল দেখি। তারপর দেখ্‌ছি কতদূর কি হয়।"

শ্যামাসুন্দরী মুখ ভার করিয়া উত্তর দিলেন, "ওর বাপ এক পয়সাও দিতে পারবে না। তারা গরীব তারা কি তোমার অত

জুলুম সহ্য কর্ত্তে পারে। মেয়েটি ভালো, গয়নাগাটি যা পারে দেবে। ছেলের বিয়ে দেবে তাতেও অমন চামারপানা কল্লে কি চলে!"

পত্নীর কথায় শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলটা ফেলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। স্বর্ণকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে বৌ করিবার জন্য শ্যামাসুন্দরীর রীতিমত একটা ঝোঁক হইয়াছিল। মেয়েটি সুন্দরী, তাহার উপর তাহার পুত্রের পছন্দ, তিনি কি তাহাতে না বলিতে পারেন! শম্ভুনাথবাবুর হাসিটা তাহার নিকট একেবারেই বিশ্রী ঠেকিল। তিনি মহা বিরক্তভাবে বলিলেন, "এতে হাসবার কি আছে, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, এক ছেলে, শিবরাত্রের সলতের মত জলছে, শুধু টাকা,—টাকা,—টাকা। টাকা যে কি হ'বে তাতো বুঝতে পারিনি?"

শ্যামাসুন্দরী নীরব হইবা মাত্র শম্ভুনাথবাবু মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "হাসির কথা কইলে না হেসে কি করি বল? বড়লোকের মেয়ে হয়ে, বড়লোকের স্ত্রী হ'য়ে তোমার এটুকু এখন জ্ঞান হয়নি যে চামার না হ'লে কি বড়লোক হওয়া যায়। চামার কি বলছো, রীতিমত বড়লোক হ'তে গেলে কসাই হওয়ার দরকার। সে যাক্‌গে মরুকগে, এতদিন যখন বোঝনি তখন মোলেও আর বুঝবে না। তোমার না বুঝলেও কিছু এসে যায় না, এটা বেশ ভালো করে বোঝা দরকার তোমার ছেলিটির। সেটিও তার মায়ের ধাত

কতকটা পেয়েছে বলেই বোধ হচ্ছে। গরীবের মেয়ের কি জান গরীবের সঙ্গেই বিয়ে হওয়া ভালো, তাতে তাদেরও মঙ্গল আর বড়লোকগুলোও তাদের লোকসান থেকে বেঁচে যায়। তারপর এ মেয়েটিকে তুমি পেলে কোত্থেকে ?”

স্বামীর কথায় শ্যামাসুন্দরীর মেজাজটা একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আশা ভঙ্গের বেদনাটা মানুষের প্রাণের ভিতরে অতি সুতীক্ষ্ণ ভাবেই বাজে। তিনি বেশ একটু করুণস্বরে বলিলেন, “সে আর শুনে তোমার দরকার কি ?”

শম্ভুনাথবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, “তবু শুন্‌তে তো ক্ষতি নেই, আর তোমার বল্লেও বিশেষ কিছু লোকসান নেই। কাজেই ওটা বলে ফেলতে পারো !”

শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে আর কোন কথাই বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখন সবই বলিয়াছেন তখন শেষটুকুই বা আর না বলেন কেন ? তাহার উপর স্বামী যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন তিনি অনিচ্ছাসত্বে বলিলেন, “পচু নিয়ে এসেছে ! মধুপুরে এরই বাপের সঙ্গে পচুর আলাপ হ’য়েছিল। এর বাপ গরীব হ’লেও বড় ভদ্রলোক। দেখ পচুর যখন পছন্দ, তখন এই মেয়েটির সঙ্গেই তার বিয়ে দাও। আমাদের ছেলের বিয়েতে টাকা নেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরাই ভালো।”

শম্ভুনাথবাবু আর একবার স্বর্ণের মুখের দিকে একটা তীব্র-

কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা ভেবেছি ঠিক তাই। ওরে কে আছিস্ ছোটবাবুকে পাঠিয়ে দেদিকি। যেমন মা,—তেমনি ছেলে। এতে কি আর বিষয় সম্পত্তি থাকে, দু'দিনে দশ ব্যাটায় সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। দু'শোবার ব'লছি, পরের দুঃখে অত প্রাণ কাঁদলে বড়লোক হওয়া যায় না, কে বা কার কথা শোনে।"

পিতার আহ্বান সংবাদ পাইবা মাত্র পরেশনাথ আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, সে পালঙ্কের নিকটে যাইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমায় ডাকছেন?"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, এই দিকে এগিয়ে এস, বলি ব্যাপার কি হে? না বাপু তোমায় আর আমি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না।"

পরেশনাথ আসিয়া পালঙ্কের ছত্রী ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পিতা নীরব হইবা মাত্র বিস্মতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের কি ব্যাপার বাবা?"

শম্ভুনাথবাবু গম্ভীরভাবে আবার কহিলেন, "এই মেয়েটিকে তুমি নাকি বিয়ে করবে বলে নিয়ে এসেছ। এটা তোমার কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না যে, গরীবের সঙ্গে বড়লোকের কোন কাজকর্ম্ম হয় না। মেয়েটি যাদের তাদের দিয়ে এস, ওসব

নবম পরিচ্ছেদ

পাগলামী ছাড়। যদি গরীব হয়, নিতান্তই যদি দয়া কর্ত্তে চাও, কিছু টাকা না হয় সাহায্য কর। যদিও সেটা অন্যায় কি করবো বল তোমার জন্যে না হয় কিছু ক্ষতি হবে।"

পরেশনাথ কোন কথা কহিলেন না। শ্যামাসুন্দরী বিরক্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "তোমার অত ক্ষতি করবার দরকার নেই,— তোমার সাহায্য কেউ চায় না।"

শ্যামাসুন্দরী স্বর্ণের হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস মা চল, তুমি ওর কথায় কাণ দিও না আমি তোমার সঙ্গেই পচুর বিয়ে দেব,— কারুর কথা শুনবো না, দেখি ওনি কি কর্ত্তে পারেন।"

শ্যামাসুন্দরী স্বর্ণকে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পরেশনাথও গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। শম্ভুনাথবাবু তাহাকে ডাকিলেন, বলিলেন, "দেখ বাপু আমার এই সমস্ত সম্পত্তির তুমিই একমাত্র মালিক। কাজেই তোমায় হুসিয়ার কর্ত্তে হয়। তোমার মায়ের স্বভাবটি পেয়েছ কি গেছ। মেয়েমানুষ দুর্ব্বল হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয় কিন্তু পুরুষ যদি দুর্ব্বল হয় তবেই বিপদ। শুধু এইটুকু মনে করে রাখবে তুমি বড় লোকের ছেলে। তোমার চাল হবে বড়লোকের মত কিন্তু ব্যবহার হবে ছোট লোকেরও বেহদ্দ। লোক্‌কে যদি ফাঁকি দেওয়া না যায় তাহ'লে কি টাকা বাড়ে। পরের দুঃখে চখে জল এলে—বুঝলে বাপু দু'দিনেই ফতুর।"

শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলটা গোটাদুই টান দিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমায় তো দুশোবার বলেছি, ছোটলোক না হ'লে কমলা বিরূপ হন। এই সব দুর্ম্মতি হ'লেই বড়লোকের ফতুর হবার বেশীদিন বাকি থাকে না। যদি ভদ্রস্ত চাও এসব মতলব ছাড়।"

পরেশনাথ তথাপি কোন কথা কহিল না, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

যাহার জন্য এত দিন কনকের বিবাহ ঠেকিয়াছিল, তাহাই যখন পরেশনাথ মিটাইয়া দিলেন তখন আর বিবাহ ঠেকিয়া থাকিবে কেন? পরেশনাথের নিজের সামান্য কিছু টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল, সে তাহা হইতে তিন সহস্র মুদ্রা বাহির করিয়া তাহার পর দিনই মহিমবাবুকে প্রদান করিল। স্বর্ণ যে দিন তাহাদের বাড়ী গমন করিয়াছিল তাহার পর এক সপ্তাহের ভিতরই কনকের বিবাহ হইয়া গেল। কনক যথা সময়ে স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। আজ কয়েক দিন হইতে মহিমবাবুর জরাজীর্ণ বাড়ীখানি বিবাহ উৎসবে জমজম হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু আজ একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। আত্মীয় কুটুম্ব বিবাহ উপলক্ষে যাঁহারা আসিয়াছিলেন বর-ক'নে বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, বিসর্জ্জনের পর ঠাকুর-মঞ্চ যেমন খাঁখাঁ করিতে থাকে আজ মহিমবাবুর বাড়ীরও অবস্থা সেইরূপ।

সন্ধ্যায় অন্ধকার কলিকাতা মহানগরীর ভিতর ঘণিভূত হইয়া উঠিয়া ছিল। রাস্তার গ্যাসগুলি ধীরে ধীরে একে একে জ্বলিয়া উঠিয়া সেই অন্ধকারকে দূরীভূত করিয়া কর্ম্ম কোলাহলময়ী

কলিকাতা নগরীকে আলোকময়ী করিয়া তুলিতেছিল। মহিমবাবু তাঁহার সেই ক্ষুদ্র বৈটকখানা গৃহের তক্তপোষের উপর চুপ করিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বরপক্ষের সন্তুষ্টির জন্য আয়োজনের কোনই ক্রটী রাখে নাই কিন্তু তথাপি তিনি বরপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। সামান্য একটা অছিলা ধরিয়া তাহারা তাঁহাকে যথেষ্ট অপমান করিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এমনই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, আর একটু হইলে বিবাহই বন্ধ হইয়া যাইত। পরেশনাথ বরপক্ষের পায়ে হাতে ধরিয়া পড়ায় কোন ক্রমে বিবাহটা হইয়া গিয়াছে। মহিমবাবু একাকী সেই তক্তপোষের উপর পড়িয়া সেই কথাই ভাবিতে ছিলেন, বরপক্ষের আচরণে তাঁহার প্রাণে একটা ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছিল, তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল বাঙ্গালির ঘরে কন্যা জন্মায় কেন? ভগবান কি পিতাকে সর্ব্বশান্ত করিবার জন্য বাঙ্গালীর গৃহে কন্যা প্রেরণ করেন। পিতার এরূপ লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেখিলে কন্যার প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে! পদে পদে যাহাদের নিকট পিতা লাঞ্ছিত হইতেছেন তাহাদের উপর কি কন্যার কখন ভক্তি আসিতে পারে! বঙ্গের ঘরে ঘরে কেন আজ এত হাহাকার,—কেন আজ শত সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে, তাহার কারণটা আজ মহিমবাবুর নিকট একেবারে স্পষ্ট হইয়া গেল। বঙ্গবালার তীব্র নিশ্বাস যত দিন পর্য্যন্ত না বন্ধ হইতেছে ততদিন বাঙ্গালীর শান্তি নাই.—সংসারের সুখ থাকিতেই

পারে না; তাহা যেন তিনি স্পষ্ট চক্ষের উপর দেখিতে পাইলেন. সঙ্গে সঙ্গে একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুকের হাড় ক'খানা নাড়িয়ে দিয়া বাহিরে বাহির হইয়া আসিল। তিনি আর স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিলেন, উচ্চস্বরে বলিলেন "স্নেহ! বাহিরের ঘরে একটা আলো দিয়ে যাও তো মা।"

ঘরখানা সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর বহুক্ষণই ডুবিয়া গিয়াছিল, মহিমবাবুর তাহা এতক্ষণ খেয়ালই হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার যেন আর অন্ধকার কিছুতেই সহ্য হইতে ছিল না। তাঁহার মনে হইতে ছিল জগতের সমস্ত অন্ধকার যেন চিরদিনের মত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য চারিদিক হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আলো লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন আনন্দময়ী,— তিনি আলোটা পিল্‌সুজের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "তুমি অন্ধকারের মধ্যে এমন করে চুপ করে বোসে রয়েছ? আলোটা দিয়ে যেতেও বল্‌তে নেই? কি ভাবছো যা হবার তাতো হয়ে গেছে, এখন ফুলশয্যেটা যাতে নিখুঁত হয় তারই ব্যবস্থা কর। কনকের আমার মুখে একটী কথা নেই অমন ঠাণ্ডা মেয়ে কি কারুর হয়। তার যদি খোঁটার ঘর হয় তা হ'লে সে বাঁচবে না। সবই যখন হ'লো তখন ফুলশয্যেটায় যেন না আর খুঁত থাকে।"

আনন্দময়ী প্রদীপটা পিলসুজের উপর রাখিয়া স্বামীর সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহিমবাবু একবার মুখটা তুলিয়া পত্নীর দিকে চাহিলেন, আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, তিনি মুখ নত করিলেন। আনন্দময়ী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন করে কি ভাবছো! ফুলশয্যেটা পাঠাতে পারলেই আপাততঃ নিশ্চিন্তি। স্বর্ণের জন্যে আর তোমাকে ভাবতে হবে না। পরেশনাথের মা বলেছেন, তিনি স্বর্ণের সঙ্গে পরেশ-নাথের বিয়ে দেবেন।"

মহিমবাবু গম্ভীর স্বরে পত্নীর কথার উত্তর দিলেন, "না, তা ভাবছিনি, ভাবছি কি জান পয়সাও সেই খরচ হ'লো কিন্তু কুটুম্ব সুবিধে হবে বলে বোধ হয় না। তখনই তোমায় বলেছিলুম যেখানে মেয়ে কর্ত্তা সেখানে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু তুমি যে একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়লে। জামাইও সুবিধে হবে না, শুনলুম নাকি বাসরেও মহা অসভ্যতা করেছে।"

আনন্দময়ী স্বামীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "না বাসরে আর এমন কি অসভ্যতা করেছে, অমন একটু সবাই করে।"

মহিমবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা তুমি যাই বল জামাই তোমার ভালো হবে না, তা আমি দু'টো একটা কথা কয়েই বুঝেছি তুমি যদি না তখন অত ব্যস্ত হতে।"

আনন্দময়ী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "আমি মেয়ে মানুষ আমি কি জানি বল! তুমিও তো সব দেখে শুনে ছিলে। সে যা হবার

তাতো হয়ে গেছে এখন আর ভেবে কি করবে বল! ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে।”

মহিমবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আগে কি ছাই জান্‌তে পেরেছিলুম, বিয়ের পর এখন অনেক কথা কাণে আস্‌ছে। বাড়ীখানাও নাকি বন্ধক আছে। তার উপর পিসি মাগী নাকি মহা দুর্দ্দান্ত, তার ঝগড়ার ঠেলায় পাড়ার লোক নাকি অস্থির।”

স্বামীর কথায় কন্যার ভাবনায় আনন্দময়ীর সমস্ত প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি মনের ভাব মনেই দমন করিয়া বলিলেন, “এখন আর সে কথা ভেবে কি করবে বলো। ভগবান কনকের বরাতে যা লিখেছেন তাই হবে। এখন ফুলশয্যের যা যা কিন্‌তে বাকি আছে তার একটা ফর্দ্দ করে ফেল। তোমার কাজ যা তুমিতো কর, তারপর যা বরাতে আছে হবেই।”

মহিমবাবুর করুণ কণ্ঠস্বর এক গাঢ় নিশ্বাসের সহিত বাহির হইল, “গিন্নি আমাদের যদি সেই বরাতই হবে তা হ’লে কি আর স্নেহের অমন হয়। পরেশনাথের কাছে কতকগুলো টাকা দেনাদার হলুম কিন্তু ফল কিছুই হ’লো না। ও দেনা কি আর কখন শোধ হবে। ঋণগ্রস্ত হয়ে মরতে হবে পৃথিবীতে এর চেয়ে আর মন্দ ভাগ্য কি আছে। শনির দৃষ্টি হ’লে এই রকমই হয়, নইলে কি আর পোড়া শোল মাছ জেন্ত হয়ে জলে ভেসে যায়। পরেশনাথের আসবার কথা ছিল কই তারওতো দেখা নেই। কাল

সমস্ত রাত জেগেছে, খুব সম্ভব শরীর ভালো নেই। পরেশনাথের ঋণ কি আর শোধ হবে!”

আনন্দময়ী কোন কথা কহিলেন না, কন্যার চিন্তায় তাহার সমস্ত প্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল। চিন্তা রাক্ষসী বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে ক্রমাগত কন্যার অমঙ্গলের সূচনা দেখাইয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া যাইতেছিল। মহিমবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনঃরায় বলিলেন, “দাঁড়িয়ে থেকে কি আর করবে যাও কাজ কর্ম্মগুলো সকাল সকাল সেরে নাওগে। বেঁচে যত দিন থাকা যাবে পেটে দুটো অন্ন দিতেই হবে। ক’দিন রাত জেগে তোমারও তো শরীর তেমন ভালো নেই সকাল সকাল রান্নাবাড়াগুলো শেষ করে ফেলগে। আমি ততক্ষণ ফুলশয্যের ফর্দ্দটা করে ফেলি।”

আনন্দময়ী আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় পরেশনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি এক পার্শ্বে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠটা একটু টানিয়া দিলেন। পরেশনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, “সব ভালোয় ভালোয় চুকে গেছে তো, আর কোন গোলমাল হয়নি। আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তাই আস্‌তে বিলম্ব হয়ে গেল।”

মহিমবাবু পরেশনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া দ্বারের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন, পরেশনাথ নীরব হইবা

মাত্র বলিলেন, "না আর বিশেষ কোন গোলমাল হয়নি। এস বাবা বসো। তুমি কাল সমস্ত রাত জেগেছ আজ আর কষ্ট করে না এলেই পারতে।"

পরেশনাথ তক্তপোষের উপর আসিয়া বসিয়াছিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "এতে আর কষ্ট কি? বর-ক'নে বিদেয় হওয়ার সময়ই আমার আশা উচিত ছিল কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে সব গোল হয়ে গেছে। কালতো আপনার জামাই এর সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা কইতে পারিনি, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই কথাবার্ত্তা হয়েছে, বি. এ. পড়ছে যখন তখন নিশ্চয়ই ভালো ছেলে।"

মহিমবাবুর বক্ষ পাঞ্জর ভেদ করিয়া আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল, তিনি পরেশনাথের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "পরেশনাথ জামাই যে বড় সুবিধে হবে বলে আমার বোধ হয় না। তার কথাবার্ত্তা শুনলে সে যে বি, এ, পড়ছে এ কথা আমার বলেই বোধ হয় না। নম্রতা যে কি তা একেবারেই জানে না। কুটুমও ভালো হবে বলে আমার মনে হয় না। তারপর এখন যা শুনছি তা যদি সত্যি হয় তাহ'লে তো মেয়েকে হাত পা বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছি। শুনলুম বাড়ীখানাও বাঁধা পড়েছে, সেখানা নাকি সম্প্রতি বিক্রয় হয়ে যাবে। ছেলে বি, এ পড়ছে বটে কিন্তু পাস করবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। কলেজে একদিনও যান না, বাড়ীতে দুটি দুটি খান আর নাকি এমেচার থিয়েটার করে বেড়ান।"

পরেশনাথ মহিমবাবুকে আর অধিক বলিতে দিল না, তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "ওসব ভেবে এখন আর ফল কি? এখন ফুলশয্যের সব কেনাটেনা হয়ে গেছে, এখন সেটা যাতে ভালো হয় তারই ব্যবস্থা করুণ। সুখ দুঃখ ভগবানের হাত, তিনি যার ভাগ্যে যেটুকু লিখেছেন সেটুকু তাকে ভোগ কর্ত্তেই হবে।"

মহিমবাবু পরেশনাথের কথার উত্তরে আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় যে ঝি কনকের সহিত কনকের শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল সে একেবারে মড়াকান্না কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া পা দুইটা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া মেজের উপর ধড়াস করিয়া বসিয়া পড়িল। ঝিকে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতে দেখিয়া গৃহের ভিতরস্থিত সকলেরই প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ঝিএর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া আনন্দময়ীর মুখখানি এইটুকু হইয়া গিয়াছিল, তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া ঝিএর দিকে একটু ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে ফিরে এলে বাছা কনক ভালো আছে তো? কি হয়েছে এমন করে কাঁদছ কেন,— কনকের কি কোন অসুক বিসুখ করেছে?"

ঝি ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "দিদিমনি মাঠাকরুণ ভালই আছে!"

আনন্দময়ী পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে জামাইএর কি কোন অসুখ বিসুখ করেছে?"

দশম পরিচ্ছেদ

ঝি ফোঁস ফোঁস করিয়া বলিল, "না গো ঠাকরুণ না!"

আনন্দময়ী মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; বলিলেন, "তবে?"

ঝি সহসা যেন বাজিকরের যাদু মন্ত্রে উঠিয়া দাঁড়াইল; হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "এমন ছোটনোকের বাড়ীতেও দিদিমনির বিয়ে দিতে হয়? জামাইবাবু আমাকে নাতি মেরে দূর দূর করে বিদেয় করে দিলে।"

আনন্দময়ীর প্রাণের ভিতর তখন প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। তিনি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুধু শুধু লাতি মেরে বিদেয় করে দিলে,—তাও কি কখন হয়!"

ঝি হাউ হাউ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এর যদি এক বর্ণ মিথ্যে হয় তবে যেন মলে আমায় শেলকুকুরে খায়। মাঠাকরুণএর একটীও কথা মিথ্যে নয়। আমি দিদিমনির কাছে চুপটি করে বসে আছি এমন সময় দিদিমনির সেই শ্বাশুড়ী মাগী এসে বল্লে এ মাগী আবার বসে কেন! রাজরাণীর সঙ্গে আবার ঝি এসেছে, বেরোও মাগী বেরোও। আমি বলার মধ্যে মাঠাকরুণ যেমন বলেছি, যে না কুটুম বাড়ীর লোককে কি এমন দূর ছাই কর্ত্তে আছে? আর যায় কোথায় অমনি না মাগী একেবারে হুমকি দিয়ে উঠলো। উগ্রু উগ্রু এ মাগীকে নাতি মেরে বেরকরে দেতো। আর অমনি না জামাইবাবু এসে আমায় তিন চার নাতি। আমি আর কি করি মাঠাকরুণ ছুটে পালিয়ে এলুম, আর দিদিমনি

অঝর ঝরে কাঁদতে লাগলো। ভগবান আছেন,—ভগবান বিচার কর্ব্বেন।”

ঝি আবার মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কাঁদিতে লাগিল। আনন্দময়ীর কণ্ঠ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না, নয়ন ফাটিয়া গণ্ড বহিয়া অশ্রুজলের বড় বড় ফোটা টস্ টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মহিমবাবু একবার মাত্র পরেশ-নাথের দিকে চাহিয়া কেবলমাত্র একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিলেন। পরেশনাথ এরূপ ব্যাপার আর কখন দেখে নাই। মানুষে যে কখন এরূপ আচরণ করিতে পারে তাহা তাহার ধারণাই ছিল না, সে একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভুলে, তাড়াতাড়ির জন্য তিনি তিন তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কন্যাকে যে একেবারে জলে ফেলিয়া দিয়াছেন তাহা বুঝিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না। পরের টাকা এমন করিয়া অপব্যয় হওয়ায় তাঁহার ভিতরটা একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবার মত হইল। দুই একটা আচরণ হইতেই মহিমবাবু বুঝিয়াছিলেন যে কুটুম্ব একেবারেই সুবিধার হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে অনুশোচনায় ফল নাই জানিয়া তিনি তাঁহার যতদূর সম্ভব নিখুঁত করিয়া ফুলশয্যার তত্ত্ব প্রেরণ করিলেন।

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, কোলাহলময়ী কলিকাতা-নগরী দুরন্ত বালকের ন্যায় সারাদিন যেন হাঁপাই জুড়িয়া ধীরে ধীরে নিদ্রার কোলে ডুবিয়া যাইতেছিল। শান্তিরাণী যেন নিদ্রার বসন পরিধান করিয়া হেলিয়া দুলিয়া কলিকাতা নগরীর উপর নামিয়া আসিতেছিলেন। উগ্রপ্রকাশের আজ ফুলশয্যা কিন্তু বাড়ীতে বিশেষ কোন ধূমধাম নাই। উগ্রপ্রকাশের কয়েক জন বিশেষ বন্ধু কেবল নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, অল্পক্ষণ হইল তাহাদেরও আহার শেষ হইয়া গিয়াছে। এইবার উগ্রপ্রকাশের ফুলশয্যা হইবে। ক্ষ্যান্তমনি তাহারই আয়োজন করিতেছিলেন। ফুলশয্যার তত্ত্ব সন্ধ্যার পরই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তত্ত্বে বিশেষ আড়ম্বর না থাকিলেও মহিমবাবু যে জিনিষগুলি দিয়াছিলেন তাহার সকল গুলিই মূল্যবান। কিন্তু ক্ষ্যান্তমনির তাহার একটীও পছন্দ

হয় নাই। ফুলশয্যার তত্ত্ব উপস্থিত হইবা মাত্র, তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিছার কামড়ের জ্বালা ধরিয়াছিল। তাঁহার গগনভেদী চীৎকারে,—মুখনাড়ায় যাহারা ফুলশয্যার তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিল তাহারা অবিলম্বে বিনা আহারে সে বাটী পরিত্যাগ করিতে পথ পায় নাই। ফুলশয্যার লোকজন বিদায় করিয়া, উগ্রপ্রকাশের বন্ধুবর্গের আহার শেষ হইলে ক্ষ্যান্তমনি একটা সন্দেশ আল্‌গোছে মুখে ফেলিয়া এক ঘোটি জল ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসে পান করিয়া যেন একটু দম করিয়া লইলেন। তাহার পর ফুলশয্যার জলখাবারের রেকাবীখানা ও ক্ষীর মুড়কির বাটী হাতে লইয়া হেলিতে দুলিতে উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ক্ষ্যান্তমনি উপরে উঠিয়া যে গৃহখানির ভিতর প্রবেশ করিলেন, সেই গৃহের মেজের উপর একখানি মাদুর পাতা, সেই মাদুরের উপর বসিয়া কনক বস্ত্রে আপাদ মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছিল। সে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া পর্য্যন্ত আদর বলিয়া একটা জিনিষ কাহারও নিকট পায় নাই। আসিয়া পর্য্যন্ত কেবলই পিস্‌শাশুড়ীর মুখ নাড়া খাইতেছে। কাল রাত্রি হইতে এ পর্য্যন্ত বোধ হয় দুই হাজারবার তাঁহার পিতার সপ্ত পুরুষ উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। সে বালিকা মাত্র, তাহার প্রাণে কত সহিবে, দুঃখে বেদনায় তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইবার মত হইতেছিল,—কেবলই নয়ন ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। সেই মাদুরের উপর

একাদশ পরিচ্ছেদ

পাড়ার আরোও কয়েকজন ললনা বসিয়া পরস্পর ফিস ফাস্ করিয়া গল্প করিতেছিল। গৃহে আর বিশেষ কোন আসবাব নাই। কেবল এক পার্শ্বে একটা বেশ পরিস্কার বিছানা পাতা। ক্ষ্যান্তমনিকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেই মাদুরে উপবিষ্ট ললনাদিগের ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "এই যে পিসি, আর রাত কোচ্ছ কেন? খাওয়া দাওয়া তো সব চুকেছে এইবার ফুলশয্যেটা সেরে নাও না। মিছে রাত করে লাভ কি?"

ক্ষ্যান্তমনি একটা দম ফেলিয়া বলিলেন, "এই মা এইবার ফুলশয্যে হবে। কাজের বাড়ী আমি একা মানুষ আর কত পেরে উঠি বল?"

পিসির কথায় বাধা দিয়া অপর একজন বলিয়া উঠিল, "সত্যিই তো ভাই, পিসি আর কত পারে, দশজন দরওয়ানে যা পারে না, পিসিকে একলা সেই কাজ কর্ত্তে হয়েছে। ফুলশয্যের অতগুলো লোক তাড়ান কি সোজা, তারা কি যেতে চায়, আর একটু হলেই হাঙ্গাম হয়ে ছিল আর কি। লুচি ভাজরে,—তরকারি কররে,—"

অপর একজন ললনা একপার্শ্বে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সে তাহার ঘোমটাটা একটু সরাইয়া বলিল, "এটা কিন্তু পিসির ভালো কাজ হয়নি, হাজার হক্ কুটুম বাড়ীর লোক তাদের অমন না খাইয়ে বিদেয় দেওয়া কোন মতেই উচিত হয়নি।"

ক্ষ্যান্তমনি দাঁড়াইয়াছিলেন, মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন,

"উচিত অনুচিত আর আমায় শিখিও না বাছা। ঢের দেখেছি,—ঢের দেখ্‌লুম, কিন্তু এমন চাষার কুটুম্ব কখন দেখেছ? ছোটলোক তার আর কত ভালো হবে, ডুলি মালাতেও তো এমন ফুলশয্যের তত্ত্ব দেয় না। অপরের কথার কাজ কি আমার যা ফুলশয্যে এসেছিল তাতে আমার শ্বশুরের সাতখানা তিন মহল বাড়ী ভরে গেছলো! ওমা এমন ছোটলোকতো কখন দেখিনি—"

পিসির কথার মাঝখানেই একজন ললনা বলিয়া উঠিল, "পিসি তোমার কথা ছেড়ে দাও, চখে দেখা পোড়া অদৃষ্টে হয়নি বটে তবে লোকের মুখে শুনিছি তো, হাঁ একটা ফুলশয্যের মত ফুলশয্যে বটে।"

ক্ষ্যান্তমনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা শুন্‌বে না কেন, সেতো আর লুকোছাপার কথা নয়। কল্‌কাতায় একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেছলো। যেমন ফুলশয্যের ছিরি তেমনি গয়না দেবার ছিরি, রাজরাণী গয়না পরে এসেছেন। এমন গয়নাও আমার বাপচোদ্দপুরুষে কখন দেখেনি। সোনার গয়না যেন ফু দিলে ওড়ে। সোনার তাই বা বিশ্বাস কি, যারা ওমন ছোটলোক তারা পেতলও দিতে পারে। বলি হাঁগো রাজরাণী তোমার বাপের কি কসায়ে ব্যবসা আছে নাকি?"

ক্ষ্যান্তমনি মুখখানা বিকৃত করিয়া কনকের চিবুক ধরিয়া মুখখানা উচু করিয়া ধরিলেন। প্রথম যে ললনাটি কথা কহিয়াছিল

একাদশ পরিচ্ছেদ

সে বলিল, "তোমার বাপের মত গয়না ক'জনে দিতে পারে পিসি? সেতো আমরা চখে দেখেছি, গয়না নয়তো যেন এক একখানা শীল। এক একখানা গয়নার ওজোন একসৈর করে ছিল। সে গয়না কি যে সে গায়ে দিয়ে নড়তে পারে।"

অপর একজন বলিল, "তা পিসি ক'নের অপরাধ কি, ওকে অমন দাঁতে দাঁতে খিঁচিয়ে ফল কি বল? সে ওর বাপের সঙ্গে বোঝগে যাও। আর মন্দই বা কি দিয়েছে বল, যা দেবার কথা ছিল সবই তো দেছে।"

ক্ষ্যান্তমনি সেই ললনার দিকে ফিরিয়া মুখখানা যেন খিঁচাইয়া উঠিলেন, "নাও বাছা তোমার ও দরদের কথা শুনে আমার গা জ্বলে যায়। আমিতো দাঁতে দাঁতে সবাইকেই রেখেছি, বাছা চোখের মাথাও কি খেয়েছ। এই দেখ না রাজরাণীর চোখের জল যেন লেগেই রয়েছে। ঠোনা মেরে মুখখানা ঘুরিয়ে দিতে হয় না!"

প্রথম যে ললনাটি কথা কহিয়াছিল সেই আবার বলিল, "পিসি, ওকথা ছেড়ে দাও তোমার মতন কি হাস্যবদন সবার হয়।"

দ্বিতীয় ললনা ক্ষ্যান্তমনির কথায় মনে মনে চটিয়া উঠিয়াছিল, সে বেশ একটু রাগতস্বরে বলিল, "নে ভাই তোর আর নেক্‌রা ভালো লাগে না। কি গুণের ছেলে তাতো জান্‌তে আমাদের

বাকি নেই, তার আবার কথা। অমন ছেলেকে যে মেয়ে দিয়েছে এই ঢের—"

ক্ষ্যান্তমনি একেবারে রাগে ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঢোল হইয়া উঠিলেন ; তিনি হাত দুইখানা সেই ললনার মুখের সম্মুখে বার পাঁচ সাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "মরিরে, মরিরে, মরি। তোর ভাতারতো খুব গুণের তা'হলেই বাঁচি। উকিল ভাতার বলে যে একেবারে চোখে কাণে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না।"

প্রথম ললনা ক্ষ্যান্তমনিকে বাধা দিয়া বলিল, "বলি পিসি কার সঙ্গে কথা কইছ? ওতো হ'লো সেদিনকার মেয়ে ও কি দেখেছে, আর কি বা শুনেছে। এখন যাও তোমার ভাইপোকে ডেকে আন, রাত ঢের হ'লো।"

"তা বাছা সত্যি বলতে কি হক কথা যা দু'একটা তোমার মুখেই শুনতে পাই. তা আমি চাই উগ্রকে ডেকে আনিগে।" ক্ষ্যান্তমনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রথম ললনা দ্বিতীয় ললনাকে বলিল, "তুই কাকে কি বল্‌ছিলি, দেখ্‌ছিস ওই দুধের মেয়েটাকে আজ দু'দিন ধরে কি জ্বালাই না দিচ্ছে। দেখ্‌লিনি খাওয়াতে হবে ব'লে ফুলশয্যের লোকগুলোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। ঐতো ছেলে আড়াই হাজার টাকা দিয়েছে তবু মন উঠ্‌ছে না। এক সঙ্গে কখন বাবার জন্মে আড়াই হাজার টাকা দেখেছে?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষ্যান্তমনিকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া ললনাগণ কথাটা শেষ না করিয়াই ঢোক গিলিল, জিজ্ঞাসা করিল, “কই পিসি তোমার ভাইপো এলো না ?”

ক্ষ্যান্তমনি যেন বেশ একটু বিরক্তির সহিত উত্তর দিল, “উগ্রুর ওই তো বদ স্বভাব। বন্ধু অন্তই যে ওর প্রাণ, বন্ধুদের পেলেতো আর ওর কিছু জ্ঞান থাকে না।”

তাহার পর তিনি কনকের দিকে ফিরিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, “না বাছা এখন আরো তোমার একটু রাখো, উগ্রু ও ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি মোটেই পছন্দ করে না। মাগো আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে কচ্ছে, কি হাড় জ্বালানো বৌই হ’লো গো,—দিন নেই, রাত নেই শুধু কান্না।”

পিসি ফরফর করিয়া আরোও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উগ্রপ্রকাশের, পিসি,—পিসি শব্দ কর্ণে যাওয়ায় তাঁহাকে নীরব হইতে হইল;—তিনি তাড়াতাড়ি দ্বারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আয় বাবা আয়! কি কর্ব্বি ব’ল তোর যেমন বরাত নইলে কখন এই ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি সাক্চুরনি তোর ঘাড়ে পড়ে।”

উগ্রপ্রকাশ টলিতে টলিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের অধিক নহে। দেহের গড়নটি বেশ ছিপছিপে,—বর্ণ গৌর। মস্তকের উপর প্রকাণ্ড টেরী, টেরীর

বাহার যথেষ্ট। বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য দেখিলে তাহাকে বেশ সৌখিন লোক বলিয়াই বোধ হয়। অঙ্গের আদ্ধির পাঞ্জাবীটা আগাগোড়া গিলে করা, তাহা হইতে সৌগন্ধের গন্ধ ভরভর করিয়া বাহির হইতেছে। উগ্রপ্রকাশ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার সেই পাঞ্জাবীর সৌগন্ধের গন্ধ ভেদ করিয়াও সুরার গন্ধে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্ষ্যান্তমনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আবার সেই লাল জলগুলো গিলিছিস্ এত করে বল্লুম তবু এই তিনটে দিন আর সবুর কর্ত্তে পাল্লিনি। তোর জ্বালায় শেষ কি আমি মাথা খুড়ে মরবো। ও ছাই না খেলেই নয়।"

উগ্রপ্রকাশ টলিতে টলিতে আসিয়া ধড়াস করিয়া সেই মাদুরের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। নেশায় তাহার চক্ষুদ্বয় মুদিয়া আসিতে-ছিল। সে জোর করিয়া একবার চাহিয়া বলিল, "পিসি শুধু তোমার কথায় দু'দুটো দিন খাইনি, আজ একটু না খেলে কি বাঁচতুম। সে যাক্ এখন নাও শিগ্‌গির কি কর্ত্তে হবে কর, আমি বেশীক্ষণ বস্‌তে পারবো না। আমায় এখনি বেরুতে হবে—বড় ভয়ানক কাজ।"

ক্ষ্যান্তমনি তাঁহার ডান হাত খানা গালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "ওমা সেকি কথারে, আজ আবার এখন বেরুবি কোথায়! আজ ফুলশয্যে আজ কি তোর বেরুতে আছে। আজকে যে বোয়ের কাছে শুতে হয়।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

উগ্রপ্রকাশ দক্ষিণ হস্তখানা তুলিয়া বলিল, "তা না'হলে আর মজা হবে কেন? দুদিন যাইনি তাতেই ঢুকতে দেয় কিনা সন্দেহ, তার উপর আজ যদি এবসেণ্ট হই তাহ'লে কি আর রক্ষে আছে। পিসি আমার হ'য়ে তুমি শুয়ো তাহ'লেই হবে। আমি আর দেরী কর্ত্তে পারিনি বাইরে সব আমার জন্যে হা করে বসে আছে। যদি কিছু করবার থাকে চটপট করে নাও।"

একজন ললনা ক্ষ্যান্তমনির কাণে কাণে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "পিসি, কার সঙ্গে কথা কইছ, দেখ্‌ছনা দুর্দ্দান্ত মাতাল হয়েছে। এখন নাও ফুলশয্যেটা শিগ্‌গির সেরে নাও।"

ক্ষ্যান্তমনি কনকের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া উগ্রপ্রকাশের পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন, ফুলশয্যার কাপড়খানা মাদুরের একপার্শ্বে পড়িয়াছিল, তিনি সেইখানা উগ্রপ্রকাশের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "নে বাবা কাপড়খানা ছেড়ে নে।"

উগ্রপ্রকাশের ঘাড়টা ক্রমেই মাটির দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছিল। সে তাহার হাত দুইখানা মেঝের উপর রাখিয়া কোনক্রমে দেহটাকে খাড়া রাখিয়াছিল, মাথাটাকে বহুকষ্টে তুলিয়া বলিল,--"না না ও কাপড়চোপড় ছাড়া এখন চলবে না,—পিসি আমি বেশ আছি।"

তারপর কনকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "মাইডিয়ার, অত ঘোমটায় মুখ ঢাকছো কেন বাবা, একটু ঘোমটা তুলে একটা নয়নবান হান।"

ক্ষ্যান্তমনি জল খাবারের রেকাবীখানা ও ক্ষীর মুড়কীর পাত্রটী আনিয়া বর ক'নের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন; বলিলেন, "ওই ক্ষীর মুড়কী একটু ক'নের মুখে দিয়ে দাওতো বাবা, দিতে হয়।"

উগ্রপ্রকাশ পাত্র হইতে খানিকটা ক্ষীর মুড়কী লইয়া বলিল, "দিতে হয় যখন পিসি তখন আমি নিশ্চয়ই দেব, মাইডিয়ার মুখ বের কর, লজ্জা কি!"

উগ্রপ্রকাশের হাত কাঁপিতেছিল, কাজেই ক্ষীর মুড়কী কনকের মুখে পৌছিল না, চোখে গালে লাগিয়া গেল। ক্ষ্যান্তমনি কনকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নাও বাছা, আর জ্বালিও না, একটু ক্ষীর মুড়কী উগ্রুর মুখে দিয়ে দাও।"

উগ্রপ্রকাশ ডান হাতখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "পিসি ওইখানটায়ই মাপ কর্ত্তে হবে, তার চেয়ে একগ্লাস মদ দাও আমি সুবোধ ছেলের মত ঢুকঢুক করে খেয়ে ফেলছি। ক্ষীর মুড়কীতে কিন্তু নেই বাবা।"

গৃহের ভিতরকার গরমে উগ্রপ্রকাশের নেশাটা একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার দেহটা আর কিছুতেই খাড়া রহিল না। সে সটাং সেই জলখাবারের রেকাবীর উপর আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ক্ষ্যান্তমনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে কি অলক্ষুণে বৌ ঘরে এলোরে,—আমার উগ্রুর একি হ'লোরে?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

রেকাবী স্থিত জল থাবার ও ক্ষীরের বাটী উল্টাইয়া গিয়া মেঝেময় ছড়াইয়া পড়িল। ফলের রসেতে, ক্ষীরেতে উগ্রপ্রকাশের সমস্ত পাঞ্জাবী ভরিয়া গেল, চেতনাহীন দুর্দ্দান্ত মাতালের কিছুই খেয়াল নাই। নেশায় তাহার দেহটা যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারে গৃহস্থিত ললনাগণ একেবারে হুড়াহুড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, একজন ললনা বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "এমন ছেলের মুখে কি কেউ নুড়ো জেলে দেয় না গো,—যখন জন্মেছিল, তখন বুঝি দেশে নুন ছিল না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আজ ঠিক তিন মাস হইল কনকের বিবাহ হইয়াছে, এই তিন মাসের ভিতর সে একটীবারের জন্যও পিত্রালয়ে আসিতে পায় নাই। মহিমবাবু বারবার গিয়া ক্ষ্যান্তমনি ও জামাতার হাতে পায়ে ধরিয়া কন্যাকে আনিতে পারেন নাই,—এমন কি তিনি কন্যার সহিত এক বারের জন্যও সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। ক্ষ্যান্তমনির মিষ্ট সম্ভাষণে প্রতিবারেই আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে হতাশ হৃদয়ে ফিরিতে হইয়াছে। পিস্‌শাশুড়ীর অসহ্য যন্ত্রণা, পিতার অপমান কনক সকলই মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছিল,—কিন্তু তাহার শরীর সহ্য করিতে পারিল না। সংসারের বাসন মাজা হইতে রন্ধন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া, অর্দ্ধ অনাহারে থাকিয়া, স্বামীর অসহ্য যন্ত্রণায় দিনরাত পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার সমস্ত দেহটা ভিতরে ভিতরে খাক্ হইয়া আসিয়াছিল। রাত্রে প্রায়ই তাহার ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হইতেছিল, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যিতে ক্রমেই তাহা ভিতরে ভিতরে বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদিন সম্ভব সে তাহার দেহটাকে খাড়া রাখিয়াছিল, তাহার পর সে শয্যা লইল। রোগ বহু পূর্ব্ব হইতেই দেহের অনেকটা স্থান জুড়িয়া ছিল, শয্যা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

একেবারে তাহা সমস্ত দেহটাকে জুড়িয়া বসিল। রোগ শয্যা গ্রহণের পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

গভীর রজনী বিশ্বজগৎ নিদ্রার কোলে নিদ্রিত, কলিকাতা নগরী শান্ত, স্তব্ধ, নীরব। অশান্তি, দুর্ভাবনা, অর্থ চিন্তায় প্রপীড়িত মানব নিদ্রারাণীর করুণ কটাক্ষে কিছুক্ষণের জন্য সে দুর্ভাবনার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া নিদ্রার কোলে চক্ষু মুদিয়া মধুর শান্তি উপভোগ করিতেছে। বিশ্ব জগৎ যখন শান্তির কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে, তখন কেবল মহিমবাবুর চক্ষে নিদ্রা নাই। কন্যার চিন্তায় তাহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না,--আহারে রুচি না থাকায় তাহাতো বহুদিন হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়। আহারীয় সামগ্রীর সম্মুখে বসিলেই, তাঁহার বড় শান্ত বড় আদরের মধ্যম কন্যার কথা আর যেন বড় করিয়া মনের ভিতর জাগিয়া উঠিত। যন্ত্রণায়, অনাহারে কন্যার দিনগুলি কি ভাবে কাটিতেছে, তাহা যেন সমুজ্জ্বল হইয়া তাঁহার চক্ষের উপর জ্বল জ্বল করিত সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আহারীয় সামগ্রী বিকট হইয়া যেন তাঁহাকে মারিতে আসিত। মোহিমবাবু বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কন্যার কথাই চিন্তা করিতেছিলেন, আর যত কিছু অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিতে পারে তাহার সমস্তই যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বায়োস্কোপের ছবির মত নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। ঘর অন্ধকার, তাঁহারই পার্শ্বে একটু দূরে আনন্দময়ী নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহার নিশ্বাস-

প্রশ্বাসের ধ্বনি ঘরটার সমস্ত নীরবতাকে চঞ্চল করিয়া মোহিমবাবুর প্রাণে বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিতে ছিল। চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মোহিমবাবু শয্যার উপর এপাশ ওপাশ করিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছিলেন,—কিন্তু চির শান্তিময়ী নিদ্রারাণী চিন্তা রাক্ষসীর ভয়ে যেন তাঁহার নিকট ঘেসিতে সাহস করিতে ছিল না। চিন্তা রাক্ষসী তাঁহার সমস্ত দেহটার উপর তখন একটা অশান্তির রাজ্য পাতিয়া বসিয়া ছিল, এমন একটুকুও ফাঁক ছিল না, যে শান্তিময়ী নিদ্রারাণী তাহার ভিতর প্রবেশ করে।

শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া ক্রমেই মোহিমবাবুর শয্যাকণ্টক হইবার মত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া যেন আগুনের হল্‌কা বাহির হইতে ছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল উন্মত্ততা ধীরে ধীরে যেন তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সেই সময় বাহিরের দরজার কড়া ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল। মোহিমবাবু শঙ্কিত হৃদয়ে একেবারে চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। কন্যার অমঙ্গলের আশঙ্কায় তখন তাহার সমস্ত প্রাণটা ভরিয়া ছিল, বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটাই যেন সর্ব্ব প্রথম তাঁহার প্রাণের ভিতর স্ববল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের বাটীর দরজার কড়াটা নড়িতেছে কিনা সেইটা সঠিক হইবার জন্য তিনি কাণটাকে একটু

খাড়া করিয়া ধরিলেন। কড়া তখনও নড়িতেছিল, তাহা যে অপরের বাড়ী নয় তাহা বুঝিতে মোহিমবাবুর বিলম্ব হইল না, কিন্তু বাহিরে যাইয়া দরজা খুলিয়া দিবার তাহার যেন সাহস হইল না, একটুকি নড়িবার শক্তিটকু পর্য্যন্ত তাহার যেন লোপ পাইয়া আসিতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে একটু সরিয়া যাইয়া পত্নীর অঙ্গ ঠেলিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিলেন। আনন্দময়ী নিদ্রার গভীর কোলে ডুবিয়াছিলেন, স্বামীর হস্ত স্পর্শের মৃদু তাড়নে তিনি একেবারে ধড়পড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। কন্যার চিন্তায় তাঁহারও প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, ঘুমের ভিতর হইতে জাগিয়া উঠিয়া আনন্দময়ী যেন একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বামীর মৃদু কণ্ঠস্বরে তাঁহার যেন চেতনা হইল। মোহিমবাবু অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "শোন দেখি আমাদের বাহিরের দরজার কড়া নড়ছে না, এত রাত্রে কে এল? কনকের তো কোন অসুখ বিসুখ করেনি।"

আনন্দময়ীর তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই, বাহিরের দ্বারের কড়া নাড়ার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, স্বামীর কথায় তিনি কাণটাকে খাড়া করিয়া ধরিলেন। দরজার কড়া নড়া তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহা যেন মহা বিভীষিকা দানিয়া তাহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিল। তিনি জড়িত কণ্ঠে মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তাইতো এত রাত্রে আমাদের বাড়া কড়া কে নাড়ছে, যাও না, উঠনা শিগগির দেখনা গো। আজ ক'দিন

থেকে কনকের জন্যে আমার প্রাণটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই তার কোন শক্ত ব্যায়রাম হয়েছে।”

কড়া নড়ার শব্দ উত্তরোত্তর ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছিল, মোহিম বাবু আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না,—তিনি দুই হস্তে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভঙ্গ স্বরে বলিলেন, “প্রদীপটা জ্বাল দেখি ?”

আনন্দময়ী বিছানায় বসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে ছিলেন,—স্বামীর কথা কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি কম্পিত হস্তে বালিশের নিম্নে দেশলাইটা খুঁজিতে লাগিলেন। দেশলাই যদিও যথা স্থানেই ছিল কিন্তু তথাপি তাঁহার কম্পিত হস্ত বার বার হাতড়াইয়াও তাহা খুঁজিয়া পাইতে ছিল না। মোহিমবাবু মেঝের উপর দাঁড়াইয়া মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, “কি হ'লো গো,—দেশলাইটা জ্বালো।”

আনন্দময়ী তখনও দেশলাইটা হাতড়াইতে ছিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, “কইগো দেশলাইটা তো পাচ্ছিনি।”

“তবে থাক আমি অমনিই যাচ্ছি,” মোহিমবাবু দরজা খুলিতে যাইতেছিলেন সেই সময় আনন্দময়ী বলিয়া উঠিলেন, “এই যে পেয়েছি গো, একটু দাঁড়াও প্রদীপটা জ্বালি।'

মোহিমবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, আনন্দময়ী দেশলাইটা জ্বালিয়া ধরিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে যাইয়া

প্রদীপটা জ্বালিয়া দিলেন। মোহিমবাবু দরজাটা খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, আনন্দময়ীও প্রদীপটা ধরিয়া স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইলেন। প্রদীপের মৃদু আলো বাহিরের অন্ধকার-টাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। মোহিমবাবু কম্পিত পদে ধীরে ধীরে যাইয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিলেন। বাহিরের দরজা খুলিবা মাত্র তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত দেহটা একেবারে বংশ পত্রের মত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বাহিরে দরজার সম্মুখে একখানি পাল্কী নামাইয়া চারিজন বেহারা মহা কোলাহল করিতেছে। দরজার সম্মুখে পাল্কী দেখিয়া, আশঙ্কায়, ভাবনায় মোহিমবাবুর কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। তিনি বেহারাদিগের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিবা চাহিতে লাগিলেন। উড়ে বেহারাদিগের মধ্যে যে একটু বয়বৃদ্ধ সে দ্বারের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আধা বাঙ্গালা আধা উড়ে ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ এই, 'বাবু বেইরামী একটা মেয়ে এসেছে। যে বাবু আমাদের সঙ্গে এসেছিল সে বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। মেয়েটির বড় শক্ত ব্যায়রাম আর বেশীক্ষণ বাঁচে কিনা সন্দেহ। বাড়ীর ভেতরে তুলে নিয়ে যান।"

উড়ে পাল্কী বেহারাদিগের খটখটে কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তিনি তাহার কোন অর্থই গ্রহণ করিতে পারিলেন না,—এইটুকু বুঝিলেন, যে পাল্কীর ভিতর যে আসিয়াছে,

তাহার কঠিন পীড়া। স্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে আনন্দময়ীও প্রদীপ হস্তে সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বেহারাদিগের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি চক্ষে সমস্ত অন্ধকার দেখিলেন, উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—“ওগো শিগ্‌গির দেখনা গো, বোধ হয় পাল্কীতে কনক এসেছে, তার নিশ্চয়ই খুব শক্ত ব্যাম।”

এই গভীর রজনীতে কনক আসিয়াছে সে কি কথা, একাকী পাল্কী করিয়া সে কখন কি শ্বশুরালয় হইতে আসিতে পারে! এও কি কখন সম্ভব। কনক আসিলে নিশ্চয়ই তাহার শ্বশুরালয়ের কেহ না কেহ সঙ্গে আসিত। আনন্দময়ীর কথা মহিমবাবু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি পত্নীর মুখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া বিহ্বলের ন্যায় কহিলেন, “কনক এসেছে, সে কি কথা, সে কখনও একলা পাল্কী ক’রে এই রাত্রে আসতেই পারে না। সে তো তেমন মেয়ে নয়, সে যে আমার বড় শান্ত মেয়ে, সে মরে গেলেও তো বাড়ী থেকে একপাও একলা বেরুবে না। কনক আস্‌তেই পারে না,—তা’ কখন হ’তেই পারে না।”

মোহিমবাবু কথাগুলো বেশ সুস্পষ্ট স্বরেই বলিয়াছিলেন, যে উড়ে বেহারাটা একবার কথা কহিয়াছিল, সেই আবার মোহিম-বাবুর নিকট কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া বলিল, ওটা বাবুতো আউছন্তি, সে গুডা ভাগুচ্ছে।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "কনক না হ'য়ে যায়, ওগো আর দাঁড়িয়ে থেক না, যাও যাও শিগ্‌গির পাল্কী থেকে তুলে নিয়ে এস, মায়ের আমার নিশ্চয়ই খুব শক্ত ব্যামো হ'য়েছে। চিকিৎসা পত্রের ভয়ে মাকে আমার এই রাত্রে এখানে রেখে গেছে। মার বোধ হয় আর বাঁচবার আসা নেই। যাও যাও শিগ্‌গির যাও কনককে পাল্কী থেকে বের করে আন। বাছা কি আর আমার বেঁচে আছে।"

বেহারা পাল্কীর দরজা খুলিয়া দিল, পাল্কীতে কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য মোহিমবাবু একটু নীচু হইয়া পাল্কীর ভিতর উঁকি দিলেন। আনন্দময়ী প্রদীপটা একটু উচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহার আলো পাল্কীর ভিতর পড়িয়া, পাল্কীর ভিতরস্থিত সমস্ত জিনিষ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মোহিমবাবু পাল্কীর দরজার সম্মুখে নীচু হইবা মাত্র তাঁহার দৃষ্টি পাল্কীর ভিতর পতিত হইল। পাল্কীর ভিতর কনকের সজ্ঞাশূন্য দেহের দিকে চাহিয়া মোহিমবাবুর যেন চৈতন্য বিলুপ্ত হইবার মত হইল। একি ব্যাপার! এমন অবস্থায়,—যখন মানুষ মরিতে বসিয়াছে, যখন জীবন-প্রদীপ নিবিবার আর বিলম্ব নাই, তখনও মানুষ মানুষকে বিদায় করিয়া দিতে পারে? এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে! মোহিমবাবু পাল্কীর দরজার সম্মুখে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, আনন্দময়ীর ব্যাকুল স্বরে তাঁহার চমক

ভাঙ্গিল। স্বামীকে পাল্কীর সম্মুখে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি অতি করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি হ্যাঁগা বেঁচে আছে তো ? দেখনা গো নিশ্বেস পড়ছে কিনা ?"

মোহিমবাবু পত্নীর কথায় পাল্কীর দরজার সম্মুখে বসিয়া মৃত্যু-মুখিন বিবর্ণা কন্যার নাসিকার নিকট হাতখানা লইয়া গেলেন, মৃদু নিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে পড়িতেছে। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর সেই নীরব রজনীর নীরবতাকে বিচলিত করিয়া যেন একটা বিভীষিকা ছড়াইয়া দিল, "হাঁ নিশ্বেস পড়ছে, এখনও বেচে আছে। প্রাণটুকু শুধু কণ্ঠায় এসে ঠেকে আছে। তিন হাজার টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিইচ্ছি, তার এই পরিণাম। মা আমার আনাহারে মুখ বুজে থেকে মরতে বসেছে, তবু বোধ হয় তারা মাকে আমার একবিন্দু জল পর্য্যন্ত দেয় নি। শেষ পাছে পোড়াবার খরচ লাগে সেই ভয়ে এই রাত দুপুরে আমার বাড়ীর দোরে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। গিন্নি তোমার বড় আদরের মেয়ে, তাদের এক একটীর বিসর্জ্জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ। স্নেহ বিধবা হ'য়েছে এর চেয়ে যে সেও সহস্রগুণ ভাল। আহাহা আমার বড় আদরের মেয়ে।"

নয়নাশ্রুতে আনন্দময়ীর বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল, তিনি অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "নাও আর দাঁড়িয়ে থেক না, কোলে ক'রে পাল্কী থেকে বের করে নিয়ে এস। আমার

বড় শান্ত মেয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছে, মরবার সময় একটু শান্তিতে মরতে দাও।"

মহিমবাবুর দেহের সমস্ত রক্ত ধীরে ধীরে মাথায় আসিয়া জমিতে ছিল,—তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি পত্নীর কথার উত্তরে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "পাল্কী থেকে বের কর্ত্তে আমার সাহসে কুলুচ্ছে না। আমি মহা পাপী আমার স্পর্শে পাছে মা আমার জন্মের মত পালিয়ে যায় আমার তাই শুধু ভয়। না,—না, আমি পাল্কী থেকে বের কর্ত্তে পারবো না।"

প্রাণের দুহিতা মরণাপন্ন সম্মুখে, জননীর প্রাণের ভিতর তখন কি হইতে থাকে জননী ব্যতীত অপরের বুঝা অসম্ভব। আনন্দময়ীর প্রাণে কি হইতেছিল তাহা কেবল অন্তর্যামিই বুঝিতেছিলেন। স্বামীর কথায় তাহার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল, তিনি প্রাণ-পণ শক্তিতে হৃদয় একটু দৃঢ় করিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ছি, এ সময় কি অমন পাগলামী কর্ত্তে আছে! আমি মেয়ে মানুষ আমি বুক বাধিতে পারছি আর পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি পাচ্ছ না। পাল্কীতে ব্যয়রামী মেয়ে পড়ে আছে এখন কি অমন অস্থির হ'লে চলে। নাও খুব সাবধানে পাজাকোলা করে আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে এস।"

মহিমবাবু প্রাণকে দৃঢ় করিলেন, কন্যাকে এরূপ অবস্থায় পাল্কীর ভিতর অধিকক্ষণ রাখা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। যখন

এখনও প্রাণটুকু বজায় রহিয়াছে তখন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে! তাঁহার সামান্য দুর্ব্বলতার জন্য যদি কন্যা মারা যায় সে খেদ যে রাখিবার স্থান থাকিবে না। তিনি অতি সাবধানে পাজাকোলা করিয়া কন্যাকে পাল্কীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। পাল্কীর বেহারাগণ নিশ্চয়ই পূর্ব্বে ভাড়া পাইয়াছিল,—কারণ মহিমবাবু কনকের অচৈতন্য দেহ পাল্কীর ভিতর হইতে বাহির করিবা মাত্র তাহারা তাহাদের পাল্কী লইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। মহিমবাবু কন্যার অচৈতন্য দেহ বাহুর উপর লইয়া বিশেষ সাবধানের সহিত ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। মহিমবাবু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে, আনন্দময়ী সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রদীপ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, মহিমবাবু বিশেষ সাবধানের সহিত পত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার পদদ্বয় ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে ছিল, তাহারা যেন আর তাঁহার দেহভার কিছুতেই বহন করিতে পারিতেছিল না।

বহু কষ্টে মহিমবাবু উপরে উঠিয়া কন্যার দেহ শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি একখানা পাকা আনিয়া কন্যার শিহরে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। কনকের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তখন প্রবল ঘর্ম্ম বাহির হইতেছিল। মহিমবাবু কন্যার শয্যার পার্শ্বে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি ধীরে

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ধীরে কনকের বাম হস্ত খানি তুলিয়া ধরিয়া নাড়ীটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নাড়ী অতি ক্ষীণ হইলেও তখনও টিপ টিপ করিতেছে। মহিমবাবু একটা গাড় নিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ ভগবান, এ কি কল্লে! কি এমন পাপ করেছি যে এত শাস্তি দিচ্ছ!"

পতি ও পত্নী ব্যাকুল দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, সহসা কনকের ঠোঁট দুইটি ঈষৎ নড়িয়া উঠিল, "মাগো আর যে পারিনি মা," বলিয়া সে ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল। আনন্দময়ী অতি করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কনক, মা আমার বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে মা?"

মহিমবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া অনন্তের সহিত মিশিয়া গেল। সমস্ত ঘরখানা যেন সেই নিশ্বাসে একটা দারুণ বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গৃহের মাঝখানে বৈদ্যুতিক ঝাড়ে কেবল মাত্র গোটা কতক আলো জ্বলিতেছিল, তাহাতেই সমস্ত ঘরখানা একেবারে ঝকমক করিতেছিল। গৃহে আসবাব পত্রের কোনই অভাব নাই, মূল্যবান আসবাবে সমস্ত গৃহখানা সজ্জিত,—যেখানে যে জিনিষটির প্রয়োজন সেইখানেই সেই জিনিষটিই আশ্রয় পাইয়াছে। মূল্যবান আসবাব পত্র বক্ষে ধারন করিয়া ঘরখানা যেন একটা নূতন শোভায় হাসিতে ছিল। এই ঘরখানা পরেশনাথের শয়ন কক্ষ। গৃহের মধ্যস্থলে একখানা শ্বেত প্রস্তরের গোল টেবিলের উপর পাদুইটা তুলিয়া দিয়া একখানা গদি আটা চেহারে ঠেস দিয়া পরেশনাথ ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার আনন্দময় জীবন যাহা এত দিন শান্তির ভিতর দিয়া বহিয়া আসিয়াছিল তাহাই এক্ষণে দিন দিন অশান্তির আলয় হইয়া উঠিতেছে। তাহার প্রাণটা একেবারে শূন্য হইয়া যাইয়া যেন ক্রমে এক মহা শূন্যের ভিতর গিয়া পড়িতেছে। পরেশনাথের আর কোন কাজেই গা লাগিতে ছিল না; লেখাপড়া কাজকর্ম্ম সমস্তই তাহার একেবারে শীথিল হইয়া পড়িতেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি তখন এক প্রহরও উত্তীর্ণ হয় নাই। পরেশনাথ তাহার শয়ন গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানা পুস্তক লইয়া বসিয়াছিল কিন্তু তিন চার ছত্রের বেশী তাহার পাঠ করা হয় নাই, পুস্তক লইয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা রাক্ষসী মার মার শব্দে তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক দখল করিয়া বসিয়াছে, চিন্তা পর চিন্তার অনন্ত চিন্তা নাগুর দোলার মত তাহাকে কেবলই দোল খাওয়াইতে ছিল। এত দিন পিতার স্নেহে মাতার আদরে তাহার জীবনটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভাবনা চিন্তা বলিয়া কোন জিনিষই তাহার ছিল না কিন্তু এক্ষণে যেন সেই জিনিষটাই তাহার জীবনের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরেশনাথ ভাবিতেছিল, পরের চিন্তায় কেন মানুষ এমন ভাবে পাগল হইয়া উঠে। তাহার তো কোন অভাব নাই; স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, দাসদাসী, গাড়ী ঘোড়া, পৃথিবীতে মানুষ যাহা চাহে তাহার তো তাহার সবই আছে তবে কেন সে সুখী হইতে পারিতেছে না! তবে কেন সে এমন করিয়া চিন্তার বোঝা মাথায় চাপাইয়া সমস্ত প্রাণটাকে দুসহ করিয়া তুলিতেছে! এ সমস্যার মীমাংসা করিবে কে? সুখ বলিয়া জিনিষটা ভগবান কি পৃথিবীতে কাহার ভাগ্যে লেখেন নাই। ঘড়ীর টন্ টন্ শব্দে পরেশনাথের প্রাণটা যেন চিন্তা সমুদ্রের ভিতর হইতে ভাসিয়া উঠিল, তাঁহার দৃষ্টি ঘড়ীর দিকে পতিত হইল। রাত্রির পরিমান জানাইয়া দিয়া ঘড়ীতে তখন টন্ টন্ করিয়া নয়টা বাজিতেছে।

পুস্তকখানা উন্মুক্ত অবস্থায় কোলের উপর পড়িয়াছিল সে তাড়াতাড়ি সেখানা তুলিয়া লইল। পুস্তকখানা তুলিয়া লইয়া সে সবে মাত্র দুই তিন পৃষ্ঠা উল্টাইয়াছে সেই সময় শ্যামাসুন্দরী আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। জননীর পদ শব্দে পরেশনাথ মুখ হইতে পুস্তকখানা সরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন। পুত্রকে মুখ হইতে পুস্তক নামাইতে দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী কহিলেন, "পচু ওনি যে তোকে খুঁঝছিলেন। আমি তো আর বাছা ঝগড়া করে পারিনি, উনিতো কিছুতেই তোর সঙ্গে মহিমবাবুর মেয়ের বিয়ে দিতে চান না। উনি আজ কোথায় এক মেয়ে দেখে এসেছেন, মেয়েটিও নাকি খুব সুন্দরী, দেবে থোবেও খুব যথেষ্ট। উনি তোর সেইখানেই বিয়ে দিতে চান। জানিস্‌ইতো উনি কখনতো কারুর কথা শোনেন না, আর ওর অমতেও তো আর বিয়ে করা উচিত নয়, কি কর্ব্বি বল উনি যেখানে বল্‌ছেন সেইখানেই না হয় বিয়ে কর। মহিমবাবুর মেয়ের বিয়ে দেখে শুনে একটা নিখুঁত পাত্রের সঙ্গে দিয়ে দে, তাতে যা খরজ লাগে সে জন্যে চিন্তা করিস্‌নি সে টাকা যেমন করে পারি আমি দেবই।"

জল হইতে উঠিয়া ভূমিতে পড়িয়া মৎস্য যেমন খাবি খাইতে থাকে জননীর কথায় পরেশনাথের বুকের ভিতরটাও সেই ভাবে খাবি খাইয়া উঠিল। স্বর্ণ যে তাহার শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে, মর্জ্জায় মর্জ্জায় মিশিয়া গিয়াছে তাহাকে কি সে প্রাণ

ধরিয়া অপরের হস্তে তুলিয়া দিতে পারে! তাহাও কি সম্ভব! জননীর কথায় সে কি উত্তর দিবে? সে নীরবে। জননীর মুখের দিকে সে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। শ্যামাসুন্দরী পুত্রের খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, পুত্রকে কোন উত্তর দিতে না দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, "কি বলিস্ বল! মেয়ে যখন সুন্দরী তখন আর মন খুঁতখুঁত করিস্নি,—ওঁর কথার অবাধ্য হস্নি।" মহিমবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবিস্নি তার যাহ'ক আমি একটা ব্যবস্থা করবোই।"

পরেশনাথ এতক্ষণে কথা কহিল। সে জননীর কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "মা তুমি বড় গলায় বলেছিলে, স্বর্ণের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, সে কথাটা স্বর্ণ শুনে গেছলো। কাজেই মহিমবাবুর বাড়ীর সকলেই সে কথা জানে। আমার মার কথার যে কখন নড়চড় হ'তে পারে এ কথা তো তারা কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পারে না, কাজেই তারা স্বর্ণের সঙ্গে আমার বিয়ে এটা স্থির জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। এখন মা আমি কোন মুখ নিয়ে তাদের বলবো যে, আমার মা স্বর্ণের সম্মুখে যা বলেছিলেন, সেটা কিছুই নয় একটা মুখের কথা মাত্র। তিনি এখন আর স্বর্ণের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি নন, কাজেই আমার অন্যত্র বিয়ে কর্ত্তে হচ্ছে। মা তারা যে তোমায় স্বর্গের দেবীর চেয়েও বেশী মনে করে সে ধারণাটা আমি তাদের কিছুতেই ভেঙ্গে দিতে পারবো না।"

পুত্রের কথায় একটা বড় রকম নিশ্বাস শ্যামাসুন্দরীর বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তিনি অতি শান্ত স্বরে কহিলেন, "কি কর্ব্ব বাছা উনি যে এক রীতের মানুষ, নইলে আমার কি অসাধ যে স্বর্ণের সঙ্গে তোর বিয়ে দিই। ওঁর ওই যে কি এক বাতিক, টাকা, টাকা, টাকা। টাকা না হ'লে উনি যে কিছুতেই তোর বিয়ে দিতে রাজি নন। ওর অমতে তো কিছু করা উচিত নয়।"

পরেশনাথ উত্তর দিল, "বাবা যদি মত না দেন তাহলে আর বিয়ে কেমন করে হবে ব'ল! কিন্তু তোমাকে মা আমি কিছুতেই খেলো কর্ত্তে পারবো না। কাজেই এ জীবনে আর আমার বিয়ে করাই হ'লো না। মা তুমি আমার আর কোন দিন বিয়ে কর্ত্তে অনুরোধ করো না।"

চিন্তা বালাই জিনিষটা কোন দিনই শ্যামাসুন্দরীর প্রাণে ছিল না। খাওয়াইয়া খাইয়া, হাসিয়া হাসাইয়া এতদিন তাঁহার দিনগুলি কাটিয়া আসিতে ছিল। নিরানন্দ তাঁহার আশে পাশেও কোনদিন ঘেসিতে পারে নাই। আজ পুত্রের কথায় তাঁহার মুখখানি একেবারে মলিন হইয়া গেল। বড় আদরের একমাত্র পুত্র, সে যদি বিবাহ না করে, তাহা হইলে কি জননীর প্রাণে সুখ থাকিতে পারে! তাঁহার যে বড় সাধ ছিল, সুন্দরী পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া, মনের মত করিয়া সাজাইবেন পরাইবেন,—আদর

করিবেন,—যত্ন করিবেন। পুত্রের কথায় তাহার এত দিনের আশা যেন একদিনেই ভূমিস্মাৎ হইবার মত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ষাট! ষাট! অমন কথা মুখে আনিস নি। জীবনে বিয়ে করবিনি সেকি কথা রে! আমাদের সাত নয় পাঁচ নয় তুই একমাত্র ছেলে তুই যদি বিয়ে না করিস, তাহ'লে আমাদের যে আর এক গণ্ডুস্ জল পাবারও আশা থাক্‌বে না। তোর যদি মহিমবাবুর মেয়েকে বিয়ে করাই একান্ত ইচ্ছে হয়ে থাকে তুই সেখানেই বিয়ে করিস্। একেবারে বিয়ে কর্ব্বোনা এমন কথা কি বলতে আছে?"

পরেশনাথ জননীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, জননী নীরব হইবা মাত্র বলিল, "মা, দুঃখীর প্রাণে দুঃখ দিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। আমাদের কি উচিত সেই দুঃখীকে আশা দিয়ে নিরাশ করা। মা, মহিমবাবুর যে কত দুঃখ সে কেবল ভগবানই জানেন। সর্ব্বশান্ত হ'য়ে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছিলেন, সেই মেয়ে বিধবা হয়েছে, অত টাকা দিয়ে সেদিন মেজমেয়ের বিয়ে দিলেন, কিন্তু জামায়ের আচরণ শুনলে তোমার চখেও জল আসবে। তারা নাকি মেয়েকে পেটভরে খেতে দেয় না। মা পৃথিবীতে এসে যদি একজন দুঃখীরও কতকটা দুঃখ লাঘব কর্ত্তে পারি, তাহ'লেও বুঝি জন্ম সার্থক হ'ল। তোমাদের তো মা টাকার অভাব নেই তবে কেন আমাকে লেখাপড়া শেখালে।

মুখ্য করে রাখলেই তো পারতে, পশুর মত দু'বেলা দু'মুঠো আহার পেলেই সন্তুষ্ট থাকতুম। পরের দুঃখ দেখে তাহ'লে তো আর আমার প্রাণ এমন ধারা কেঁদে উঠ্‌তো না। পৃথিবীর কিছুই দেখ্‌তুম না,—শিখ্‌তুম না,—অন্ধ হ'য়ে জন্মাতেম অন্ধ হ'য়েই মারা যেতেম।"

পুত্রের কথায় শ্যামাসুন্দরীর সমস্ত প্রাণটুকু যেন গলিয়া গেল। তাঁহার বুকের ভিতর ছিল কেবল মাতৃস্নেহ, তাহাও তিনি যে নিঃশেষ করিয়া পুত্রের উপর ঢালিয়া দিয়াছেন। পুত্রের ইচ্ছাই যে তাঁহার পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তিনি তাহাতে কি আপত্তি করিতে পারেন? শ্যামাসুন্দরী অতি মধুরস্বরে বলিলেন, "তারা গরীব বটে কিন্তু তোর মাতো গরীব নয়। তোর যখন ইচ্ছে মহিমবাবুর মেয়েকে বিয়ে কর্ব্বি তখন আমি তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। নে অমন মুখভার করে বসে থাকিস্‌নি।"

জননীর কথায় একটা ক্ষীণ আশা পরেশনাথের প্রাণের ভিতর ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। কিন্তু পিতার কথা মনে হওয়ায় আবার তাহার সমস্তই যেন অন্ধকার হইয়া গেল। পিতা যে এ বিবাহে কিছুতেই মত দিবেন না, তাহা পরেশনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল! তাঁহার অমতে কি তাহার বিবাহ করা উচিত,—সে বিবাহ কি সুখের হইবে? পুত্র হইয়া পিতার অমতে পিতার প্রাণে কষ্ট দিয়া সে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারে না। পরেশনাথ

মৃদুস্বরে কহিলেন, "মা, বাবা এ বিয়েতে কিছুতেই মত দেবেন না। তাঁর অমতে, তাঁর প্রাণে কষ্ট দিয়ে কি আমার বিয়ে করা উচিত! তার চেয়ে বিয়ে একেবারে না করাই আমার পক্ষে মঙ্গল।"

শ্যামাসুন্দরী আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু স্বামীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন। শম্ভুনাথবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া পুত্রের সম্মুখে দাড়াইলেন। পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া পরেশনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শম্ভুনাথবাবু একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিলেন, "বোস, বোস, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি আবার কলকাতায় রওনা হয়েছ। তুমি যে আজ এমন চুপটি করে নিজের ঘরটির ভেতর বসে আছ, কেমন করে জানবো ব'লো? কল্‌কাতায় না গিয়া এমন করে ঘরটির ভেতর চুপটি করে বসে আছ ব্যাপার কি? কলকাতায় ওই যে কে তোমার এক জোচ্চর জুটেছে, সেখানে যে আজ বড় যাওনি? সাধে বলি কল্‌কাতা একটা সাংঘাতিক জায়গা। কি ফ্যাসাদ দেখ না কেন, মেয়ে ছেড়ে দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা। গেরো কি কম।"

পিতার কথায় পরেশনাথের মুখের উপর একটা বিষাদের ছায়া একেবারে ঘনিভূত হইয়া উঠিল, সে কোন কথা কহিল না,

নীরবে মস্তক অবনত করিয়া রহিল। শ্যামাসুন্দরী বেশ একটু কুপিতকণ্ঠে কহিলেন, "কেন তুমি তাদের অমন অকথা কুকথাগুলো বল্‌ছ। তোমার কি সব অনাছিষ্টি।"

শম্ভুনাথবাবু হাঁকিলেন, "ওরে কে আছিস্ এক কল্কে তামাক নিয়ে আয়!"

তাহার পর পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জোচ্চরকে জোচ্চর বল্লে যদি কুকথা বলা হয় তাহ'লে তো আমি নাচার। এই ছেলেটিকে যদি নির্ব্বোধ বলি, তোমায় যদি আমি মুট্‌কি বলি তাহ'লে কি সে গালাগালি দেওয়া হয়। যে যা তাকে যদি তাই বলা হয় তাহ'লে সে গালাগালি দেওয়া হয় না,—সত্য কথাই বলা হয়।"

শ্যামাসুন্দরী স্বামীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তারা গরীব হ'তে পারে কিন্তু জোচ্চর নয়। জোচ্চর যদি পৃথিবীতে কেউ থাকে সে তুমি। লোক ঠকান তো হ'লো তোমার একচেটে ব্যবসা।"

শম্ভুনাথবাবু পত্নীর কথায় মৃদু হাসিলেন; ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "আরে আমরা হ'লুম বড়লোক আমাদেরতো আখ্যাই হ'লো তাই। জোচ্চর না হ'লে কি কেউ কোন দিন বড়লোক হ'তে পেরেছে। পৃথিবীতে টাকাটা তো আর বাড়ছে না,—তার পরিমান তো সমানই আছে। কেবল হাত

বদল হচ্ছে বইতো নয়। বড়লোককে তুমি জোচ্চর বলতে পার, নচ্ছার বলতে পার;—পৃথিবীতে যা কিছু গালাগালি আছে সে গুলো সবই দিতে পারো। যখন গালাগালি গুলো ঠিক খাপে খাপে বসে যায় তখনই সে বড় লোক, একেবারে যথার্থ বড় লোক হয়ে দাঁড়ায়। টাকা বড় শক্ত জিনিষ—পৃথিবীর গাল না কুড়ুতে পাল্লে কি আর টাকা করা যায়। আমাদের ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের প্রথম গালাগালি সুরু হ'লো ননি চোরা, মাখম চোরা, তারপর একটু বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'লো গোপীর মনহরা, বসন চোরা। তারপর তো পৃথিবীর যা কিছু গালাগাল সমস্ত গুলোই বেশ জমাট হয়ে বসে ছিল, ছলি, কপটি, জোচ্চর, নচ্ছার পাজি ইত্যাদি প্রভৃতি কত আর বলবো। তবে তিনি ভগবান হতে পেরেছিলেন,—স্ত্রী রূপে কমলা তাই তাঁর ঘরে বাঁধা ছিল। আমায় তুমি যত জোচ্চর, নচ্ছার বলবে ততই আমি বুঝবো বড় লোক হচ্ছি।”

ভৃত্য গুড়গুড়ির উপর কলিকা বসাইয়া ফুঁ দিতে দিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া শম্ভুনাথবাবুর সম্মুখে গুড়গুড়িটা রাখিয়া তাহার নলটা তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। শম্ভুনাথবাবু নলটায় গোটা-কতক টান দিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তারপর সেই জোচ্চরটার ঠিকানাটা কি বল দেখি? লোকটার সঙ্গে আমার একবার দেখা কর্ত্তে হচ্ছে।”

পরেশনাথ মস্তক না তুলিয়াই অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাবা আপনি তাকে জোচ্চর বলবেন না। তাঁর মতন লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। তাঁর দুঃখের শেষ নেই, তবু তাঁর প্রাণে কখন জুচ্চরীর মতলব আস্‌তেই পারে না। বাবা তিনি আপনার কৃপার প্রার্থী, তাকে অমন কুকথা বলবেন না।"

শম্ভুনাথবাবু তখন তাম্রকূটের সুগন্ধে সমস্ত ঘরখানা ভরাইয়া ফেলিয়াছিলেন; পুত্রের কথায় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সেই জন্যইতো তার অত দুঃখ। আচ্ছা তিনি না হয় জোচ্চর নাইবা হলেন এখন সেই মশাই ব্যক্তির ঠিকানাটা কি শুনি! একবার সেই পুণ্যাত্মার সঙ্গে আমার দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।"

শ্যামাসুন্দরী বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "তার সঙ্গে দেখা করার তোমার আবার কি প্রয়োজন? পচু আর অন্য কোথাও বিয়ে করবে না,—যদি তুমি সেই মেয়েটির সঙ্গে ওর বিয়ে না দাও তা হ'লে ও মোটেই বিয়ে করবে না তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

শম্ভুনাথবাবু পত্নীকে বাধা দিলেন; তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সেই জন্যই তো সেই মশাই ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা করার প্রয়োজন। একবার তাকে গলবস্ত্র হয়ে গিয়ে বলিগে যাই, যে বাপু আমার ছেলেটির উপরে এ অত্যাচার কেন? কলকাতায় তো আমার চেয়ে আরো অনেক নাম কার বড় লোক আছে। আমার সাত নয় পাঁচ নয় একটী ছেলে, সেটিকে অনুগ্রহ করে অব্যাহতি দিন,

আমি তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। বলি লোকটা কি বশীকরণ বিদ্যেটিদ্যে জানে নাকি হে। তাহ'লে আবার ছাড়ান মন্ত্র গুলো শিখে যেতে হবে।"

পরেশনাথ মস্তক তুলিল ; পিতার কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনার আর কষ্ট করে যাবার কোন দরকার নেই। আমি কালই তাদের বলে আসবো, যে আমার বাবার অমত কাজেই আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে পারলুম না ; আমায় মাপ কর্ব্বেন।"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "এইতো আমার ছেলের মত কথা। তবে বাপু তুমি যখন তাদের আশা দিয়ে ফেলেছ তখন এটুকুও না হয় ওর সঙ্গে জুড়ে দিতে পার যে, আপনার মেয়ের বিয়ের খরচটা আমরাই দেব। দেখে শুনে একটা ছেলে আপনি ঠিক করে ফেলুন আর তাও যদি না পারেন সেটাও না হয় আমরাই ঠিক করে দেব।"

স্বামীর কথায় শ্যামাসুন্দরীর রাগে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, বলিলেন, "নাও তোমার আর অত উদারতায় কাজ নেই। কিন্তু আমিও তোমায় বলে রাখলুম ওই মহিমবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমি পচুর বিয়ে দেব, দেব,—দেব।"

শ্যামাসুন্দরী আর এক মুহূর্ত্তও তথায় না দাঁড়াইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শম্ভুনাথবাবু পত্নীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া

"ওগো শোন,—শোন," বলিয়া বার পাঁচ সাত চীৎকার করিয়া উঠিলেন কিন্তু শ্যামাসুন্দরী আর ফিরিলেন না। শম্ভুনাথবাবুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,"দেখ বাপু বাপের ওপর একটু নির্ভর করে দেখ, যদি ওর চেয়েও সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে না পারি তবে আমার নাম শম্ভু-নাথ ঘোষই নয়। মনের ভিতর কতকগুলো ধোঁয়া ঢুকেছে, ওটাকে বেশ করে সাফ্ করে ফেল। যৌবনে ওরকম আমাদেরও হয়েছিলো,—হবারই কথা। দুদিন পরে সংসারে ঢুকলে ওসব আর কিছু থাকবে না। ওরে কে আছিস্ গুড়গুড়িটাকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে আয়।"

শম্ভুনাথবাবু পুত্রের গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পরেশ-নাথ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেই গদি আঁটা চেয়ারটার উপর হেলিয়া পড়িলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পিতা মহিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান, শুনিয়া পর্য্যন্ত পরেশনাথের বুকের ভিতরটা গুরগুর করিতে আরম্ভ করিয়া ছিল। পাছে পিতা, মহিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতকগুলা খটখটে কথা শুনাইয়া তাঁহার জ্বালার শরীরে আরোও জ্বালা প্রদান করেন, সেই আশঙ্কাটাই পরেশনাথের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া ছিল। তাই সে সমস্ত কথা পূর্ব্বেই মহিমবাবুর নিকট খুলিয়া বলিবার জন্য একেবারে মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই সে মহিমবাবুর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। রাত্রেই সে ভৃত্যকে বলিয়া রাখিয়া ছিল, যেন প্রভাতেই কোচম্যান গাড়ী জুতিয়া আনে। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "ছোটবাবু গাড়ী এসেছে!"

পরেশনাথ জুতা পরিতেছিলেন, মস্তক না তুলিয়াই বলিলেন, "যা, যাচ্ছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল, পরেশনাথও বেশ বিন্যাস শেষ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে যাইতে ছিল, কিন্তু পিতাকে উপরে উঠিতে দেখিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

শম্ভুনাথবাবু সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো বাবু, এত ভোরে কোথায়? কল্‌কাতায় নাকি হে?"

পরেশনাথ অবনত মস্তকে উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ, কল্‌কাতায় যাচ্ছি, একটু দরকার আছে?"

শম্ভুনাথবাবু উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন; বলিলেন, "কল্‌কাতায় তো এখন বড়ী ঘড়ীই দরকার হবে; সে যাক্ যখন যাচ্ছ তখন সে কাজটাও একেবারে শেষ করে এস। বলো বাবা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন, কাজেই আপনার মেয়েটিকে আর আমি বিয়ে কর্ত্তে পারবো না। স্পষ্ট বলাই ভালো, লোক্‌কে আশায় আশায় রাখা একেবারেই উচিত নয় বুঝলে। যদি দেখ এক কথায় উদ্ধার পেলে তো ভালই নয় তো শেষ কথাটাও জুড়ে দিও, আপনার মেয়ের বিয়ের খরচটা আমরাই দেব। গেরোয় যখন ধরেছে তখন তো কিছু যাবেই। হাঁ, তাহ'লে আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন যাও। বেশী বেলাটেলা করো না, তোমার শরীরটা যে একেবারেই ভালো নয়, ওটা যে বোঝনা সেইটুকুই তোমার দোষ।"

শম্ভুনাথবাবু নিজের গৃহের দিকে চলিয়া গেলেন, পরেশনাথও আর এক মুহূর্ত্তও তথায় অপেক্ষা না করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। গাড়ী তাহাকে লইয়া কলিকাতাভিমুখে ধাবিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গাড়ী যখন মহিমবাবুর বাড়ীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল তখন বেলা বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছিল,—রৌদ্র একেবারে প্রখর হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পরেশনাথ কম্পিত হৃদয়ে গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহিমবাবুর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পরেশনাথ একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে যে মানুষ আছে তাহা বলিয়াই বোধ হয় না, একটা স্তব্ধ নিস্তব্ধতার ভিতর সমস্ত বাড়ীখানা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। এত বেলা হইয়াছে, সূর্য্যের কিরণ রীতিমত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে তথাপি মহিমবাবুর বাড়ীতে কাহারও সাড়া শব্দ নাই কেন? পরেশনাথ উঠানের মাঝখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বারবার উপরের দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সে ভীতপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "স্বর্ণ, স্বর্ণ।"

কোন সাড়া শব্দ নাই, স্তব্ধ নীরবতা পরেশনাথের স্বরে বিচলিত হইয়া তাহার সমস্ত প্রাণটাকে একেবারে চঞ্চল করিয়া তুলিল;— যেন একটা কিসের বিপদের আশঙ্কায় তাহার স্বর ভগ্ন হইয়া আসিতেছিল। পরেশনাথ উপরে উঠিবে না ফিরিয়া যাইবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে না পারিয়া পাষাণের মত উঠানের মাঝখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ সে সেইভাবে দাঁড়াইয়াছিল তাহা তাহার জ্ঞান নাই, সহসা নারী কণ্ঠের কোমলস্বরে সে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। পশ্চাতে স্বর্ণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া

আছে। একটা নিবিড় বিষাদে আজ তাহার মুখখানির উপর কে যেন একরাশ কালি ঢালিয়া দিয়াছে। ক্ষুদ্র বালিকার মুখের উপর দুর্ভাবনার রেখাগুলি একেবারে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া পরেশনাথের সমস্ত বুকটা একেবারে দরদর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া ছিল। একটা যে কোন ভয়াবহ বিপদ আসিয়া মহিমবাবুর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে আর তাহার কোনই সন্দেহ রহিল না। সে কিছুক্ষণ স্বর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভীতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বর্ণ, এত বেলা হ'য়েছে তবু তোমাদের বাড়ীতে কারুর সাড়া শব্দ নেই কেন? তোমাদের বাড়ীতে কি কারুর অসুখ বিসুখ ক'রেছে? তোমার বাবা কি বাড়ী নেই?"

স্বর্ণ অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "মেজদির বড় অসুখ, বাবা তাই ডাক্তার ডাকৃতে গেছেন!"

মেজদির অসুখ সে কি! কনক কি তাহা হইলে তাহার শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছে! বিস্ময়ে কৌতূহলে পরেশনাথের প্রাণটা ফুলিয়া উঠিয়াছিল, সে মহা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কনক কোথায়? সে কি শ্বশুরবাড়ী থেকে এখানে এসেছে? তার অসুখ কবে হ'লো?"

স্বর্ণ অবনত মস্তকে তখনও দাঁড়াইয়াছিল, সে অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "মেজদি কাল রাত্রে এসেছে; তার বড় অসুখ। আসুন না ওপরে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরেশনাথের প্রাণ কৌতূহলে দুলিতে ছিল, সে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। সে পূর্ব্বে শুনিয়া গিয়াছে যে, মহিমবাবু বারবার গিয়াও কনকে এক দিনের জন্যও আনিতে পারেন নাই। তাহার পিস্‌শাশুড়ী স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিল, তাহাদের বাটীতে তাহারা তাহাদের বউকে এক দিনের জন্যও পাঠাইবে না। এ অবস্থায় যখন তাঁহারা কনককে পাঠাইয়াছেন, তখন তাহার রোগ যে কঠিন পরেশনাথের তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। স্বর্ণ নীরব হইবা মাত্র সে তাড়াতাড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তার অসুখের খবর পেয়ে তোমার বাবা বুঝি কাল তাকে নিয়ে এসেছেন ?"

স্বর্ণ মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "না,—কাল অনেক রাত্রে তারা পাল্কী করে মেজদিদিকে নিয়ে এসে আমাদের বাড়ীর দোর-গোড়ায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে।"

ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে সে কি কথা! পরেশনাথ স্বর্ণের কথার বিশেষ কোন অর্থই উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে মৃদু কণ্ঠে কেবল মাত্র বলিল, "চল ওপরে দেখিগে তোমার মেজদি কেমন আছে ?"

স্বর্ণ কোন কথা কহিল না ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল,—পরেশ-নাথ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিল। মহিমবাবুর বাড়ীখানি ক্ষুদ্র,—উপরে কেবল মাত্র তিনখানি ঘর। একখানিতে

তাঁহার কন্যারা শয়ন করিত, অপরখানিতে তিনি নিজে থাকিতেন। তৃতীয় খানি খালিই পড়িয়াছিল।

পরেশনাথ স্বর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া মহিমবাবু যে গৃহে শয়ন করিতেন তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। আনন্দময়ী কনকের শিহরে বসিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে ছিলেন, পরেশনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবগুণ্ঠনটা মস্তকোপরি তুলিয়া ছিলেন; স্বর্ণের দিকে ফিরিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "যা স্বর্ণ পরেশনাথের বসবার জন্যে একটা কিছু পেতে দে।"

"না—না কিছু পাতবার কোন দরকার নেই, মেঝে বেশ পরিষ্কার আছে,—আমি এইখানেই বস্‌ছি।" পরেশনাথ, কনক যে বিছানায় শুইয়াছিল তাহা হইতে একটু তফাতে গিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। কনকের রুগ্ন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সে একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। আজ এখনও তিন মাস হয় নাই সেই বিবাহ রাত্রে সে কনককে দেখিয়াছিল, সে মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির কোনই সাদৃশ্য নাই। এত শীঘ্র যে মানুষের দেহের এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে পরেশনাথের একেবারে তাহা ধারণাই ছিল না। বহু কাল ধরিয়া রোগে বিছানায় পড়িয়া থাকিলেও মানুষের এমন বিশ্রী চেহারা হয় কি না সন্দেহ! কনকের দেহে মাংস বলিয়া একটা জিনিষ আর কোন স্থানেই ছিল না। কেবল

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ঝিরঝিরে হাড় কয়খানা একটা চামড়া দিয়া ঢাকা রহিয়াছে মাত্র। চোখ একেবারে কোটরে ঢুকিয়াছে,—দেহে এক বিন্দুও রক্ত নাই, সমস্ত দেহটা একেবারে নীলমূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। প্রাণটুকু এখন যে বাহির হয় নাই মৃদু নিশ্বাস সেইটুকু কেবল জানাইয়া দিয়া অতি ক্ষীণ ভাবে পড়িতেছে। পরেশনাথের পলক শূন্য নয়ন কনকের রোগ শয্যার দিকে স্থির হইয়া ছিল। তাহার বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আনন্দময়ীর করুণ স্বরে তাহার সমস্ত দেহটা যেন একবারে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সে ঘাড় ফিরাইয়া আনন্দময়ীর দিকে চাহিল। আনন্দময়ী মৃদু স্বরে বলিলেন,—"বাছা আমার না খেতে পেয়ে মরতে বসেছে। আমার এমন পোড়া বরাৎ;—তোমার একরাশ সেই টাকা খরচ হ'লো কিন্তু এমন কুটুম্ব হ'লো যে—"

আনন্দময়ীর কথা বন্ধ হইয়া গেল,—অশ্রুজল বুকের চাপা বেদনাটাকে একেবারে কণ্ঠের নিকট ঠেলিয়া তুলিল। তিনি অঞ্চলে নয়নদ্বয় ঢাকিলেন। আনন্দময়ীর বুকে যে কি ব্যথা বাজিয়াছে পরেশনাথ তাহা বুঝিল। সে ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিল। স্বর্ণের বিবাহের কথাটা বলিবার জন্য সে প্রাতে উঠিয়াই মহিমবাবুর বাড়ী ছুটিয়া আসিয়াছিল,—কিন্তু কনকের অবস্থা দেখিয়া সমস্তই তাহার ওলোট পালট হইয়া গেল। পৃথিবী যে দিন রাত ঘুরিতেছে এত দিনে সেইটা যেন একবারে তাহার চক্ষের

সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দিনের আলো,—প্রখর সূর্য্যের কিরণ তাহার চক্ষের সম্মুখে একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গেল। পরেশনাথের মনে হইল সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা অন্ধকারের গোলা,—তাহার ভিতর একটুও আলো নাই।

স্বর্ণ চৌকাটের বাহির হইতে দরজার ভিতর দিয়া মুখটা বাড়াইয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা দিদি জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালে, উনুনে আগুন দিয়ে ভাত কি চড়িয়ে দেবে? বেলা অনেক হয়ে গেছে।"

আনন্দময়ী অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "পোড়া পেটেতো দুটো দিতেই হবে,—সে মানুষটা ত সারা রাত ঘুমুইনি,—ভাবনায় চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে,—পিত্তি পড়ে আবার অসুখ বিসুখ কর্ব্বে। বল্‌গে যা, হাঁ, উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে ভাতে ভাত চড়িয়ে দিতে। চাল খুব কম নিতে বলিস,—আমার তো ক্ষীদে তেষ্টা একেবারেই নেই,—না খেলেও হয়।"

স্বর্ণের কণ্ঠস্বরে পরেশনাথ দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল,—স্বর্ণের বিষাদমাখা মুখখানা আজ যেন তাঁহাকে চাবুক মারিল। স্বর্ণকে অপরের হাতে তুলিয়া দিবে এটা যে সে কল্পনা করিতে পারিয়াছে ইহাতেই তাহার প্রাণের উপর একটা বিষম ঘৃণা জন্মাইয়া দিল। জীবন থাকিতে সে যে স্বর্ণকে অপরের হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে না,—তুলিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব,—সেটাও সে আজ প্রাণে

প্রাণে উপলব্ধি করিল। স্বর্ণ চলিয়া যাইতেছিল, আনন্দময়ী তাহাকে ডাকিলেন, বলিলেন, "অনেক বেলা হয়ে গেছে,—পরেশনাথও এখানে খেয়ে যাবে তার জন্যেও চারটি চাল বেশী নিতে বলিস্।"

পরেশনাথ আনন্দময়ীর কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না, আমি খাব না। আমি এখুনি আসছি বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আমি না ফেরা পর্য্যন্ত মা খাবেন না। আমায় বাড়ী গিয়েই খেতে হবে। আমার খাবার জন্যে ব্যস্ত হবার কি আছে?"

আনন্দময়ী অশ্রু জড়িত কণ্ঠে পরেশনাথের কথার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু স্বর্ণ বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মা, বাবা আস্ছেন, ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে।"

কন্যার কথায় আনন্দময়ী তাহার সংযত বস্ত্রটা আরও একটু ভাল করিয়া সংযত করিয়া লইলেন। পরেশনাথের দেহটাও একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল এইবার তাহাও যেন একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। মহিমবাবু ডাক্তার লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরেশনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আনন্দময়ী অবগুণ্ঠনটা আরও খানিকটা টানিয়া দিয়া একটুখানি সরিয়া বসিলেন। মহিমবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া পরেশনাথকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে পরেশনাথ,—কতক্ষণ এলে?"

পরেশনাথ কেবলমাত্র বলিল, "এই কতক্ষণ হ'লো।"

মহিমবাবুর সহিত যে ডাক্তার বাবুটি আসিয়াছিলেন,—তাঁহার পরিধান কোট প্যাণ্ট; দেখিলে বেশ শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়াই বোধ হয়। অহঙ্কার কিংবা গর্ব্বের লক্ষণ তাহার শরীরে বিশেষ কিছুই নাই। তিনি ধীরে ধীরে যাইয়া রোগীর বিছানার একপার্শ্বে বসিলেন। তাহার পর রোগীর দেহটা একবার আপাদ মস্তক বেশ একটা প্রখর দৃষ্টিতে দেখিয়া নাড়ীটা পরীক্ষা করিবার জন্য কনকের বাম হাতখানি তুলিয়া ধরিলেন। কিছুক্ষণ নাড়ি পরীক্ষার পর তিনি মহিমবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার মেয়ে কি পেট ভরে খেতে পেত না? অনেক দিন অনাহারে দুর্ব্বল হয়ে পড়ায় এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে। রোগ আর কিছুই নয়, ভয়ঙ্কর দুর্ব্বলতা। শরীরে রক্ত আছে ব'লেই বোধ হয় না। এ সব রোগের ওষুধ নেই বললেই হয়,—সেবাই হ'লো এর একমাত্র ওষুধ। একটু অসতর্ক হ'লেই সর্ব্বনাশ;—মৃত্যু পর্য্যন্ত হ'তে পারে।"

ডাক্তারবাবুর কথার কেহই কোন উত্তর দিল না। তিনি তাঁহার পকেট হইতে বুক দেখা যন্ত্রটা বাহির করিয়া, বুকটা একবার পরীক্ষা করিবার জন্য কনকের অঙ্গ হইতে বস্ত্রটা একটু সরাইয়া দিলেন। কনকের সর্ব্বাঙ্গে কাল শিরার দাগ। ডাক্তারবাবু বেশ একটু বিস্মিত ভাবে দাগগুলি বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষার পর মহিমবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এটি কি আপনার মেয়ে?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মহিমবাবু কন্যার দিকে হা করিয়া চাহিয়া ছিলেন, অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

ডাক্তারবাবু তখন বুক দেখা যন্ত্রটা কনকের বক্ষে বসাইয়া ছিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মেয়ে কি আপনার কাছেই থাকেন, না শ্বশুরবাড়ী ছিলেন ?"

মহিমবাবুর মৃদু স্বর অতি মৃদু ভাবে বাহির হইল, "না, এতদিন শ্বশুর বাড়ীই ছিল। কাল রাত্রে এখানে এসেছে।"

ডাক্তারবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ !"

তিনি বুক দেখার যন্ত্রটা পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "না, এখনও বিশেষ আশঙ্কার কিছু হয়নি, তবে সেবা, যত্ন, পত্থির বিশেষ লক্ষ রাখা উচিত। আপনার জামায়ের চরিত্র বোধ হয় বিশেষ ভাল নয়। আপনার মেয়ের গায়ে সব মারের চিহ্ন রয়েছে। সে যাক্ আমি এখন একটা ইন্‌জেক্ট করে যাচ্ছি এতেই এই ঝিমুনিটা কেটে যাবে। তারপর যে ওষুধটা লিখে দিয়ে যাচ্ছি সেটা তিন ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করে খাওয়াবেন। আমার বিশ্বাস এতেই বিশেষ ফল হবে। শারিরীক যন্ত্রনায় এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে, একটু যত্ন নিলেই সেরে যাবার সম্ভাবনা।"

ডাক্তারবাবু কনকের হস্তে একটা ইন্‌জেক্ট করিয়া দোয়াত ও কলম আনিতে বলিলেন। স্বর্ণ দরজার পাশটিতে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল মহিমবাবু তাহাকে হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন।

স্বর্ণ দোয়াত কলম আনিতে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; বলিলেন, "আমাদের দেশের পুরুষগুলো, মেয়ে মানুষদের কুকুর শেলেরও অধম ভাবে। বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে যে যন্ত্রণা দেয় অপর জাত তা কল্পনাতেও আনতে পারে না। আমাদের দেশের মেয়েদের সহ্যগুণ অসীম। অত যন্ত্রণা তারা যে কি করে মুখ বুজে সহ্য করে সেইটাই আশ্চর্য্য।"

স্বর্ণ দোয়াত কলম ও কাগজ লইয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার-বাবু একটা প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া দিয়া বিদায় হইলেন। তিনি গৃহ হইতে বাহির হইতে হইতে বলিলেন, "ওষুধটা খেয়ে কেমন থাকে বিকেলে একবার খবর দেবেন।"

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ আর কাহার মুখে কোন কথা নাই—সহসা মহিমবাবু পরেশনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "পরেশনাথ সব শুনেছতো। পাছে পোড়াবার খরচ লাগে সেই ভয়ে মেয়েটাকে কাল রাত্রে দরজার গোড়ায় ফেলে দিয়ে পালিয়েছে! তোমার কাছে দেনাদার হলুম অথচ জামাইও ভাল হলো না। স্নেহ যখন বিধবা হ'লো তখন ভেবেছিলুম এর চেয়ে বুঝি বেশী সাজা মানুষের আর কিছু নেই, কিন্তু এখন ভাবছি এর চেয়ে যে কনকের বিধবা হওয়াই ছিল ভালো। না খেতে দিয়ে এমন করে মারতে পারে এমন পাষণ্ড মানুষও যে পৃথিবীতে আছে তা আমার একেবারে ধারনাই ছিল না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরেশনাথ কোন উত্তর দিল না। তাহার উত্তর দিবার শক্তিও ছিল না,—তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, মানুষ মানুষের উপর এত অত্যাচার কেমন করিয়া করে? আপনার স্ত্রী, ভগবান নারায়ণশীলাকে সাক্ষী করিয়া যাহার সুখ দুঃখের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপর এই পৈশাচিক অত্যাচার করিয়া জগতের সম্মুখে মুখ দেখাইতে কি একটুকুও লজ্জা বোধ হয় না! মহিমবাবু একটুখানি নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অসময় তুমি যে আজ কলকাতায় এসেছ,—বিশেষ কোন বরাৎ টরাৎ ছিল না কি?"

পরেশনাথ মাথাটা একবার চুলকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, এমন বিশেষ কিছু বরাৎ নয় তবে,—

মহিমবাবু অতি শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি—"

তবে যে কি সেটা এ অবস্থায় পরেশনাথের বলা অসম্ভব। এ অবস্থায় সে যে স্বর্ণকে বিবাহ করিতে পারিবে না সে কথা তাহার মুখ হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারে না। সে বার কতক আমতা আমতা করিয়া বলিল, "না তবে বিশেষ কিছু নয়। বাবা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে—"

মহিমবাবু পরেশনাথকে বাধা দিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তার সঙ্গে দেখা করবো সেটা তো আমার সৌভাগ্য। আমার

আগেই দেখা করা উচিত ছিল কিন্তু দেখিতেই তো পাচ্ছ বাবা, নানা ঝঞ্ঝাটে কিছুই হয়ে উঠছে না। কনক একটু ভালো হ'লেই আমি নিজে গিয়ে দেখা করে আসবো।"

পিতার কথাটা তুলিয়া পরেশনাথ যেন মহা বিপদে পড়িলেন। পিতার সহিত সক্ষাৎ করা যে, বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় নয় তাহা সে মহিমবাবুকে কেমন করিয়া বুঝাইবে! সে বলিতে গিয়াছিল এক মহিমবাবু বুঝিলেন অন্য। পরেশনাথ মহা বিচলিত হইয়া বলিল, "বাবার সঙ্গে আপনার দেখা করবার বিশেষ কোন আবশ্যক নেই। এর পর যখন হক্ সুবিধে মত দেখা করলেই চলবে। এমন বিশেষ কোন কাজ নেই তো।"

মহিমবাবু ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কি কথা বাবা, তার সঙ্গে আমার দেখা করা সব আগেই উচিত ছিল। আমি যত শীঘ্র পারি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। তুমি যা আমাদের করেছ তাকি বাবা ভোলবার। তোমার ঋণ কি এ জীবনে শোধ হবে।"

সহসা কনকের মৃদু কণ্ঠস্বর কর্ণে যাওয়ায় মহিমবাবু তাড়াতাড়ি ফিরিলেন। কনকের ঠোঁট দুইটি কাঁপিতে ছিল, একটা অতি ক্ষীণ মৃদু স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "নাগো আর আমার মেরো না, আর মারলে আমি বাঁচবো না গো। ওগো তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি গো!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এক ফোঁটা অশ্রু কনকের নয়নের কোনে আসিয়া জমিল, আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি তাহা অঞ্চল দিয়া মুছিয়া দিলেন। কনক একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। মহিমবাবু পরেশনাথের দিকে চাহিয়া অতি করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "পরেশনাথ বাঙ্গালীর মেয়েরা কি শুধু যন্ত্রণা সহ্য করতেই জন্ম নিয়েছে। গো হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা করলে তবে বোধ হয় বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের জন্ম হয়।"

পরেশনাথ কোন কথা কহিল না. একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহার সমস্ত বুকটা ভরিয়া গিয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শম্ভুনাথবাবুর বাড়ীর সম্মুখে ক্ষুদ্র একটু কম্পাউণ্ড ছিল, সেই কম্পাউণ্ডের চারি পার্শ্বে কয়েকটা টপে কয়েকটা ফুলের গাছ বেশ মানান সই করিয়া সজ্জিত ছিল। মাঝখানের খালি স্থানটুকু দূর্ব্বাদলে পরিশোভিত হইয়া কম্পাউণ্ডের শোভা বৃদ্ধি করিত। সেই খালি স্থানটুকুতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কয়েকখানি চেহার পাতিয়া শম্ভুনাথবাবুর আসর বসিত। আসরে বড় একটা লোকজন যে হইত তাহা নহে, পাড়ার দুই একজন লোক কখন কদাচিৎ আসিয়া বিনা পয়সার তাম্রকূট সেবন করিয়া যাইত। সে আসরে তাঁহাকে ও তাঁহার বৃদ্ধ সরকারকেই প্রায় দেখা যাইত। সে দিনও শম্ভুনাথবাবু নিয়মানুসারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই কম্পাউণ্ডের মাঝখানে খালি স্থানটুকুতে একখানা আরাম কেদারের উপর পড়িয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। আসর একেবারে শূণ্য এমন কি সরকার মহাশয়ও আসিয়া একখানা কেদারা দখল করিয়া বসেন নাই। সূর্য্য সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে,—পৃথিবী তখন গোধূলীর ধূসর বসন পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্নিগ্ধ শান্ত বায়ু ঝিরঝির করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া যাইতেছে। শম্ভুনাথবাবু

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মগ্ন আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরাম কেদারাখানার উপর পড়িয়া ভাবিতেছিলেন, "চাউলের বাজার এখন খুবই ঢিমে যাইতেছে এই সময় কিছু চাউল খরিদ করিয়া রাখিতে পারিলে বেশ দুই পয়সা লাভে চড়া বাজারে ছাড়িতে পারা যায়। চাউল এক্ষণে যেরূপ নামিয়াছে,—ইহা অপেক্ষা আর অধিক নামা একেবারেই অসম্ভব। যত শীঘ্র সম্ভব কিছু চাউল খরিদ করা উচিত।"

একখানা গাড়ীর শব্দে শম্ভুনাথবাবুর চিন্তার মুখে বাধা পড়িল, গাড়ীখানা আসিয়া তাঁহার ফটকেই দাঁড়াইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া হাঁকিলেন, "ওরে কে আছিস্,—দেখত গাড়ীতে আবার কে এল!"

গাড়ীতে কে আসিল তাহাকে আর দেখিবার অবসর হইল না। একটী ভদ্রলোক গাড়ী হইতে নামিয়া শম্ভুনাথবাবুর কম্পাউণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভদ্র লোকটির বয়স চল্লিশ পয়তাল্লিশের অধিক নহে। বর্ণ বেশ গৌর,—চক্ষে সোণার চশমা। বেশ ভূষা দেখিলে তাঁহাকে বনিদী বড়লোক বলিয়াই বোধ হয়। অঙ্গুলীতে কয়েকটা মূল্যবান অঙ্গুরী ঝক্‌মক করিতেছে। তিনি বরাবর কম্পাউণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়া একেবারে শম্ভুনাথবাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়ীখানা ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া শম্ভুনাথবাবু ফটকের দিকেই চাহিয়াছিলেন, ভদ্রলোকটি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র তিনি বেশ একটু বিস্মিতের

ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসুন, তারপর আপনার কোথা হ'তে আগমন হ'চ্ছে ?"

শম্ভুনাথবাবু আরাম কেদারা খানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন, তাঁহার চারি পার্শ্বে কয়েকখানা খালি কেদারা রক্ষিত ছিল, ভদ্রলোকটি তাহার একখানা দখল করিতে করিতে বলিলেন, "আমার নাম নীলরতন সরকার আমি এসেছি—"

শম্ভুনাথবাবু আরাম কেদারা খানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন; নীলরতনবাবুকে আর কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, "ওঃ বুঝেছি। হুঁ;—বসুন, বসুন। তারপর কথা হচ্ছে এই আপনার লোকতো আমার কাছে এক দিন এসে ছিল। যা বল্‌বার তার সবইতো তার কাছে বেশ বাঙ্গালায় বলে দেওয়া হয়েছে। তারপর তার মুখে যখন সব শুনে আপনি স্বয়ং এসেছেন তখন দেখছি আপনি আমার কথাতেই সম্মত। তা যদি হয় তা হ'লে বলুন এক দিন না হয় গিয়ে আপনার মেয়েকে দেখে আসি। ওরে কে আছিস্ গোটাকতক পান নিয়ে আয়।"

নীলরতন বাবু কেদারাখানার উপর বসিয়াছিলেন; অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আপনি যখন ওর কমে সম্মত নন তখন রাজি না হয়ে আর উপায় কি ? তবে কি জানেন আমি পণ প্রথার চিরদিনই বিরুদ্ধে। এই পণ প্রথার জন্যে আমাদের সমাজে কন্যার বিবাহে কন্যার পিতা একেবারে সর্ব্বশান্ত হয়ে যাচ্ছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বড় বড় ঘর একেবারে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, এ বিষয় আমাদের সকলেরই কিন্তু একটু লক্ষ্য করা উচিত।"

ভৃত্য পানের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইল। শম্ভুনাথবাবু একখানা কেদারা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "নে ওইখানে রেখে যা।"

তারপর নীলরতনবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "খুব ভালো কথা,—আমার এই ছেলেটির বিয়েটি হয়ে যাগ তারপর আমি একেবারে পণ প্রথার বিরুদ্ধে হাঁপাই জুড়বো অখন। আপনি যখন পণ প্রথার বিরুদ্ধে এমন ধারা কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন তখন আমার খুবই বিশ্বাস আপনার বোধ হয় সব ক'টিই মেয়ে। ব্যাপার কি,—পুত্র সন্তান কি আপনার একটাও নেই!"

নীলরতন বাবু তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়। আমার যদিও সব ক'টিই মেয়ে কিন্তু তা ব'লে যে আমি পণ প্রথার বিরুদ্ধে তা নয়। আমার যখন বিয়ে হয় তখন থেকেই আমি পণ প্রথাব বিরুদ্ধে ছিলুম। এই জন্যে আমার বিয়ের সময় আমার পিতার সঙ্গে আমার রীতিমত বিরোধ হয়ে ছিল কিন্তু কি করবো তখন তো আমার কোন হাত ছিল না।"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "তাতো বটেই। আমার ছেলেও আপনার মত ঠিক ওই পণ প্রথার বিরুদ্ধে,—ঠিক আপনারই মত তারও তো কোন হাত নেই। কথাটা হচ্ছে কি জানেন, যার

দানকর্ম্মে প্রাণ চায় তার প্রায়ই দেখা যায় পয়সা থাকে না আর যার পয়সা আছে তার আবার দান করবার ইচ্ছে হয় না। আপনার ছেলের বিয়েতে পণ নেবার ইচ্ছে নেই অথচ আপনার ছেলে নেই। আমার পন নিতে বেশ রীতিমতই ইচ্ছে আছে অথচ আমার ছেলে আছে। তারপর আপনার এটা হ'লো কি জানেন, ভগবানের মার! মেয়ে ক'টি?"

নীলরতনবাবু মৃদু হাসিলেন, বেশ শান্ত স্বরেই বলিলেন, "মেয়ের ভাগ্যিটা তা আমার বেশ ভালোই। আমার ছেলে নেই বটে কিন্তু মেয়ে ন'টি!"

আর একটু হইলেই শম্ভুনাথবাবু একেবারে আরাম কেদারাখানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন আর কি। তিনি নিজেকে খুব সামলাইয়া ফেলিয়া বলিলেন,—"ভালো বলে ভালো একেবারে রীতিমত ভালো। এমন ভালো যে ওই পঞ্চাশ হাজার টাকাতেও আপনার মেয়েটিকে আমার ঘরে আন্‌তে বুকের রক্ত শুকিয়ে কাট হ'য়ে উঠ্‌ছে। আপনার পত্নী কি এখনও জীবিত? আর কিছুকাল এইভাবে গেলে আপনার বাড়ীখানা যে একটা মেয়ের আড়ৎ হয়ে দাঁড়াবে দেখছি। আপনার পিতা কত টাকা নিয়ে এই মেয়েটিকে ঘরে এনে ছিলেন? মেয়ের যখন ন'টি তখন আপনার শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রুণের বোধ হয় উনিশটি মেয়ে!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নীলরতন বাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞে একেবারে উল্‌টো; আমার শ্বশুরের আমার স্ত্রীই হচ্চে একমাত্র মেয়ে। আমার শালা দু'টি! আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়, আমার ন'টী মেয়ে বলে যে আমার মেয়েরও ন'টী হবে তার কোন মানে নেই।

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনি তো সোজায় এক কথায় বলে দিলেন, তার কোন মানে নেই কিন্তু মানে যদি বেশ সরল হ'য়ে দাঁড়ায় তা'হলেই একেবারে চিত্তির আর কি? পঞ্চাশ হাজার টাকার দশগুণ সুদ দিলেও তার জের মিটবে কিনা সন্দেহ। আপনার মেয়েটীকে ঘরে আনা যায় কিনা সেটা একটা মস্ত ভবানার কথা। এ আর চাল নয় যে কিছু দিন ধরে রেখে বাজার বুঝে ছাড়ব মেয়ের বিয়ে ও আর ধরে রাখবার জোটি নেই সাই সাই করে বয়স বাড়তেই থাকবে। আপনার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়ার ভেতর দেখছি বিস্তর কথা রয়েছে?"

শম্ভুনাথবাবুর কথায় নীলরতন বাবুর মুখখানা বেস একটু ম্লান হইয়া পড়িল। তাঁহার নয়টী কন্যা সে অপরাধ তো তাঁহার নয়। ভগবান তাঁহাকে নয়টী কন্যা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহারতো কোন হাত নাই। নীলরতনবাবু করুণ স্বরে বলিলেন, "তা'হলে মেয়ে দেখতে যাবার কি হবে?"

শম্ভুনাথ বাবু উচ্চৈস্বরে হাঁকিলেন, "ওরে কে আছিস কল্‌কেটা বদ্‌লে দিয়ে যা।"

তাহার পর নীলরতনবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মেয়ে দেখতে যাব কবে সে একটা ভাববার কথা। কথা হচ্ছে এই আপনার মেয়ের যদি ছেলে এক রাশ হয় তাতে বিশেষ কিছুই এসে যাবে না কিন্তু যদি মেয়ে হতে আরম্ভ হয় তাহ'লেই কথাটা একেবারে শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনার মেয়ে দেখতে যেতে বিশেষ আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে আপনার মেয়ের হাতখানা বেশ করে একটা বড় জ্যোতিষির কাছে দেখালেই ভালো হয়। আপনার মেয়েটির ছেলে ভাগ্যিই বা কি রকম আর মেয়ে ভাগ্যিই বা কি রকম। বিষয়টা বেশ একটু গুরুতর কিনা তাই চিন্তা। তা যাহ'ক একটা জ্যোতিষি ফ্যোতিষি দিয়ে আপনার মেয়ের হাতটা দেখান।"

পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যায় করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে যাইতেছেন,—তাহার উপর এত হাঙ্গামা। শম্ভুনাথবাবুর কথায় নীলরতনবাবু মনে মনে বেশ একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি একটু চাপা স্বরে বলিলেন, "আপনি এমন বিচক্ষণ লোক হ'য়ে ওই সব বুজ্‌রুকি বিশ্বাস করেন! আমিতো ওসব জ্যোতিষি টোতিষি বিশ্বাস করিনি। মেয়ের ভাগ্যে যা আছে তা হবেই, তখন আর জ্যোতিষি দেখিয়ে ফল কি! বড় দুঃখের বিষয় যে আপনি ওই সব বুজ্‌রুকি এখন বিশ্বাস করেন।"

ভৃত্য আসিয়া কলিকাটা বদলাইয়া দিয়া গেল,—শম্ভুনাথবাবু

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "বুজ্‌রুকি কি সাধে আর বিশ্বাস করি দায়ে পড়ে বিশ্বাস করায়। এদিকে হ'লো পঞ্চাশ হাজার টাকা, ওদিকে হ'লো মেয়ে হবার সমস্যা;—ফ্যাসাদ দু'দিকেই। কাজেই জ্যোতিষি ডাকতে হয়। এগুলেও বিপদ পেছুলেও বিপদ বুঝতেইতো পাচ্ছেন!"

নীলরতনবাবু ক্রমেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিলেন, তিনি কথাটাকে একেবারে খোলসা করিবার জন্য আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু তাহার বলা হইল না। অপরিচিত একজন আগুন্তককে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তাহাকে নীরব হইতে হইল। শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলটায় টানের উপর টান দিতেছিলেন, তিনি একরাশ ধোঁয়া আগুন্তকের মুখের উপর ছাড়িয়া দিয়া, চোখ দুইটা বেশ একটু বড় করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আগমন হ'চ্ছে কোথা থেকে?"

আগন্তুক অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমার নাম মহিমচন্দ্র বসু। আমি আস্‌ছি কল্‌কাতা—"

শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলটা ফেলিয়া দিয়া হাতখানা নাড়িয়া বলিলেন, "বাস, বাস্, হয়েছে, আর বলতে হবে না। বসতে আজ্ঞা হক্। ওরে কে আছিস্ এক ছিলিম তামাক দে,—তামাক দে—"

শম্ভুনাথবাবুর বিকট অভ্যর্থনায় মহিমবাবু একেবারে থ'হইয়া

গিয়াছিলেন। তিনি নীরবে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে শম্ভুনাথবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শম্ভুনাথবাবু আবার বলিলেন, "আর দাঁড়িয়ে কেন, একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে দখল করে বসুন,—দখল করে বসুন।"

মহিমবাবু একাবারে ভ্যাবাচেকা খাইয়া গেলেন, তিনি অতি সন্তর্পণে একখানা চেয়ার টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন; অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমার ঢের আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল, কিন্তু আপনি বোধ হয় সবই শুনেছেন, বিপদের ওপর বিপদের হাঙ্গামায় আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পারিনি।"

শম্ভুনাথবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা বেশ করেছেন, সে জন্যে বিশেষ কিছু এসে যাচ্ছে না, দায়ে পড়ে আমাকেই আপনার বাড়ী আর একটু হ'লেই ছুট্‌তে হ'চ্ছিলো। দায় জিনিষটা এমনি বালাই,—তার উপর আবার একটা মস্ত টাকার কথা রয়েছে। এখন কথা হ'চ্ছে এই কৃপা করে আমার ছেলেটিকে পরিত্রাণ দিতে হবে। বুঝতেই তো পাচ্ছেন এ বাজারে যদি আপনার মেয়েটির সঙ্গে আমার ছেলেটির বিয়ে দিতে হয় তাহ'লে আমার পঞ্চাশ হাজারটি টাকা লোকসান। কথাটা যে নিছক সত্যি তা প্রমাণ এই ভদ্রলোক। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারেন। বলুন না মশাই কথাটা সত্যি কি না?"

নীলরতনবাবু কন্যার বিবাহ চিন্তায় ভিতরে ভিতরে একেবারে

অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহে যে এত জ্বালা এতদিন তাহা তিনি টের পান নাই। এইটিই তাঁহার প্রথম কন্যা। তিনি বরাবর এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, যে আমার টাকা আছে কন্যার বিবাহ আমি যখন মনে করিব তখনই প্রদান করিব ; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সে ধারণা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, শুধু টাকা থাকিলেই যে কন্যার বিবাহ হয়—তাহা নয়। কন্যার বিবাহের যন্ত্রণা অনেক। একরাশ টাকাও খরচ, অথচ পরের দ্বারস্থ হইয়া মোসাহিবী করার ভীষণ যন্ত্রণা তাঁহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিতে ছিল। তিনি বেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। শম্ভুনাথবাবুর, বলুন না মশাই শব্দে তিনি তাড়াতাড়ি একটা যা হয় উত্তর দিয়া বসিলেন, "যন্ত্রণা বলে যন্ত্রণা এ যন্ত্রণা যেন শত্রুরও না হয়। বাঙ্গালীর মেয়ে হবার মতন পাপ বোধ হয় আর কিছু নেই।"

শম্ভুনাথবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যন্ত্রণা কি অযন্ত্রণা সে কথাটা জিজ্ঞাসা করা আপনাকে একেবারেই হয়নি সেটা জানবারও আমাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই—আপনি এই ভদ্রলোকটির দিকে ফিরে বেশ একটু পরিষ্কার ভাবে বলুন যে, আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজি কি না ?"

কথাটা বলিয়া নীলরতনবাবু বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন, উত্তরটা যে তিনি ঠিক দেন নাই কথাটা

বলিয়াই তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সম্মত বলেই তো আমি এসেছি, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার মেয়েটিকে আপনার পুত্রবধূ করেন, তাহ'লে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেই প্রস্তুত আছি। আপনি একবার দেখে আসবেন চলুন,—আমি বাপ আমার বলা শোভা পায় না, কিন্তু আমার মেয়ে ডানাকাটা পরী না হ'লেও সুন্দরী যে এ কথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে।"

শম্ভুনাথবাবু যে কি বলিতেছিলেন, তাহার এক বর্ণও মহিমবাবু এতক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই, এতক্ষণে ব্যাপারটা কতকটা উপলব্ধি করিলেন। তিনি অতি মৃদুস্বরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শম্ভুনাথবাবু নীলরতনবাবুকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি যখন আপনার মেয়ের রূপ একেবারে রূপো দিয়ে ঢেকে দিতে চাচ্ছেন তখন তো আর ওর ভেতর রূপের কথা মোটেই আসতে পারে না। রূপোর চাঁদির টুনটুন্ শব্দের কাছে কি আর কোন রূপ আছে? তবে ওই সমস্যা যদি আপনার মত আপনার মেয়েরও বছর বছর একটী করে মেয়ে হয় তাহ'লেই তো বিপদ।"

নীলরতনবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাহ'লে কি করবেন সেটা একটু জান্‌তে পারলে আমি এখন উঠ্‌তে পারি; সন্ধেও প্রায় হ'লো।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "করাকরি আর কি একটা জ্যোতিষি ফোতিষি দেখাতে হবে এই যা। তা আপনি একটা দিন স্থির কর্ত্তে পারেন, সেই দিন না হয় আমি একটা জ্যোতিষি নিয়ে আপনার মেয়েটিকে দেখে আসবো। কিছু খরচ হ'বে তা বলে আর কি কচ্ছি।"

নীলরতনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "সেই ভালো। তাহ'লে আপনি বুধবার দিন একবার অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ী পায়ের ধূলো দেবেন। আমি তবে এখন বিদায় হই।"

"সেই ভালো কথা," শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইলেন। নীলরতনবাবু নমোস্কার করিয়া বিদায় হলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, কেবল গুড়গুড়ির ঘড়ঘড় শব্দ মৃদু মৃদু হইতে লাগিল। সহসা শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া বলিলেন, "এইবার আপনি একটু অনুগ্রহ করলেই আমি এই পঞ্চাশ হাজারটি টাকা ঘরে তুলতে পারি। স্ত্রীর মাথা গরম,—ছেলের মুখ ভার একদিকে, আর একদিকে পঞ্চাশ হাজারটি টাকা। ফ্যাসাদের ওপর ফ্যাসাদ একেবারে মহা ফ্যাসাদ। আপনি এক মেয়ে ছেড়ে দিয়ে আমায় এত গুলো ফ্যাসাদের ভেতর ফেলে দিয়েছেন। একেবারে পঞ্চাশ হাজারটি টাকায় যা, আমার এ ক্ষতিটা ক'রে আর আপনার লাভ!"

মহিমবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অতি বিনীত স্বরে বলি-

লেন, "আপনার যাতে ক্ষতি হয় এমন কাজ আমার দ্বারা কথন হবে না। আপনার ছেলে আমার যা করেছে, তা তো ভোলাবার নয়। সে ঋণ আমার জীবনে শোধ হবে না। আপনার যাতে ক্ষতি হবে এমন কাজ আমি করবো এ কথা আপনি মনেও স্থান দেবেন না।"

শম্ভুনাথবাবু ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "ঋণ টিন সব শোধ, একেবারে কইফিয়ৎ টেনে দিন। কথা হচ্ছে কি জানেন বড়লোকের ছেলের সঙ্গে গরীবের মেয়ের বিয়ে হলে সে বিয়ে ঠিক খাপ খায় না। জোর করে শেয়ালের ধড়ে হাতীর মাথা বসিয়ে দেওয়া হয়!"

মহিমবাবু অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আপনি যা বল্‌ছেন, সেটা সত্য কথা, তবে—"

শম্ভুনাথবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আর ওর ভেতর তবেটবে গুলো ঢোকাবেন না। তবে যা তারও আমি ব্যবস্থা কর্ত্তে রাজি আছি। আপনাকে কিছু কর্ত্তে হবে না, আপনারা যেমন গেরস্থ সেই রকম একটী গেরস্থের মত পাত্র দেখে, তার যা কিছু ব্যয় দিয়ে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেব। অনুগ্রহ করে আমার ছেলেটিকে পরিত্রাণ দিন।"

শম্ভুনাথবাবু নীরব হইবা মাত্র মহিমবাবু সুস্পষ্টস্বরে উত্তর দিলেন,—"আমি মন খুলে বল্‌ছি আপনার যেখানে ইচ্ছে হয়

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আপনি আপনার ছেলের বিয়ে দিন, আমার তাতে কোন দুঃখ নেই। আপনার অনুগ্রহ থাকলেই আমার যথেষ্ট, আমি আর কিছু চাইনি। আমি গরীব বটে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই। আপনি ঠিক জানবেন আপনার অমতে আমি কখনই আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দেব না।"

"বাস্ বাস্ আর বলতে হবে না," শম্ভুনাথবাবু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহ'লে একবার আপনাকে বাড়ীর ভেতর যেতে হবে, শুধু এই কথাটুকু বেশ ভালো করে আমার গিন্নিকে বুঝিয়ে দিয়ে যান। আপনি তারপর একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যান। শম্ভুনাথ ঘোষের কথার কখন নড়চড় হয় না। পনের দিনের ভেতর আপনার মেয়ের বিয়ে একেবারে অবধারিত। আপনার মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আমার ছেলের বিয়ে দিচ্ছিনি, আপনাকে নিশ্চিন্ত করে তবে আমি আমার ছেলের বিয়েতে হাত দেব।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্রদীপ তৈলাভাবে নিবিতে বসিয়াছিল, তৈল পাইবা মাত্র সে আবার জ্বলিয়া উঠিল। অনাহারে কনক মরিতে বসিয়াছিল, জননীর স্নেহস্পর্শে, আন্তরিক সেবা যত্নে তাহার জীবন-প্রদীপ আবার ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। মরণের সহিত অনাহারে, অনিদ্রায় যুদ্ধ করিয়া আনন্দময়ী যেন মরণের কোল হইতে কন্যাকে কাড়িয়া আনিলেন। কনক আজ দু'টি পথ্য পাইয়াছে, যদিও সে এখনও খুব দুর্ব্বল কিন্তু আর জীবনের আশঙ্কা নাই। আনন্দময়ী গৃহের মেঝের উপর কাপড়খানা পাতিয়া বহুদিন পরে আজ আবার একটু নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়াছেন, নিদ্রাদেবী বহুকাল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; আজ তাঁহাকে একটু নিশ্চিন্ত দেখিয়া তিনি তাঁহার নয়নদ্বয়ে একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন। গৃহের এক কোনে একটী প্রদীপ জ্বলিতে ছিল, সেই প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া স্বর্ণ আপন মনে একখানা খাতায় যাহা তাহা লিখিতে ছিল। স্নেহ কনকের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অতি মৃদুস্বরে তাহার সহিত দু'একটা কথা কহিতে ছিল;—সেই সময় বাহিরে ডাক্ হরকরার কণ্ঠস্বরে "চিঠি নিয়ে যাও" শব্দে তিন ভগ্নিই বেশ

একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। স্নেহ স্বর্ণের দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "যানা ভাই স্বর্ণ চিঠিখানা নিয়ে আয় না। পরেশবাবু আজ ক'দিন আসেননি, সেইজন্য তিনিই বোধ হয় চিঠি লিখেছেন?"

স্বর্ণ তাহার খাতাখানা ধীরে ধীরে মুড়িয়া রাখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চিঠিখানি আনিতে নীচে চলিয়া গেল। স্নেহ কনকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এখন আর কার ভাই চিঠি আসবে, নিশ্চয়ই পরেশবাবুর শরীর ভালো নয়, আসতে পারেননি তাই বোধ হয় চিঠি লিখেছেন?"

স্নেহের কথা শেষ হইতে না হইতেই, স্বর্ণ একখানি পত্র হস্তে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। স্নেহ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠিরে?"

স্বর্ণ মাথাটা নাড়িয়া উত্তর দিল, "মেজদিদির।"

মেজদিদির শুনিয়া স্নেহ যেন বেশ একটু বিস্মিত হইয়া পড়িল, ধীরে ধীরে বলিল, "কনকের চিঠি! কনককে চিঠি লিখলে কে? চিঠিখানা কোথা থেকে আসছে?".

স্বর্ণ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "খামে করা চিঠি, কোথা থেকে আসছে কেমন করে জানবো।"

মেজদিদির চিঠি শুনিয়া পর্য্যন্ত কনক চিঠিখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, স্বর্ণ তাহার হস্তে চিঠিখানি দিল। কনক

বালিসের উপর ভর দিয়া একটু উচু হইয়া উঠিয়াছিল, পত্রের শিরনামাটা দেখিয়া তাহার সমস্ত শরীর একেবারে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এ যে তাহার স্বামীর হস্তাক্ষর! এ হস্তাক্ষর কি সে ভুলিতে পারে! অত অনাদর, অত যন্ত্রণা সত্ত্বেও রোগ উপশমের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দিনরাত স্বামীর কথাই যে কেবল মনে হইতেছিল। তিনি তাঁহাকে ফেলিয়া পলাইয়াছেন, আর কি তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন! নারীর ইষ্টদেবতা,—জন্ম জন্মান্তরের সাধনার সামগ্রী তিনি যদি তাহাকে আর গ্রহণ না করেন তাহা হইলে সে কেমন করিয়া জীবন বহন করিবে! নারীজীবন যদি স্বামী পূজায় উৎসর্গ না হয় তাহা হইলে সে জীবন বহন করিয়া ফল কি! চিঠিতে তিনি কি লিখিয়াছেন,—হয়তো কোন নিষ্ঠুর সংবাদ বিষধর সর্পের মত খামের ভিতর ফণা গুটাইয়া আছে, খামখানি খুলিবা মাত্র সে একেবারে ফণা তুলিয়া তাহার হৃদয়ে দংশন করিবে। কনকের দুর্ব্বল হস্ত ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। স্নেহের দৃষ্টি ভগ্নির ভাবান্তর লক্ষ করিল,—সে মৃদুস্বরে বলিল, "কার চিঠিরে জামাইবাবুর বুঝি, তোর অসুখের কোন খবর টবর পায়নি তাই বোধ হয় খবর জেনে পাঠিয়েছেন! স্বর্ণ প্রদীপটা এই দিকে নিয়ে এসে ধর, জামাইবাবু কি লিখেছে,—তোর মেজদি পড়ে দেখুক।"

দিদির আদেশ পাইয়া স্বর্ণ প্রদীপটা শয্যার নিকট আনিয়া

ধরিল। কনক প্রাণকে একটু দৃঢ় করিয়া ধীরে ধীরে খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠিখানি বাহির করিল। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে তাহার বুকের ভিতরটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। চোখের জল সে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিল না, টস্‌টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে চিঠিখানা কোন ক্রমে পাঠ শেষ করিয়া,—সেখানাকে বিছানার পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া বালিসের ভিতর মুখ লুকাইল। কনককে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে দেখিয়া স্নেহ মহা ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "জামাইবাবু কি লিখেছেরে,—অমন করে ফুলে ফুলে কাঁদছিস্ কেন! চিঠিতে কি কোন মন্দ খবর আছে?"

কনক কোন উত্তর দিল না—সে আরোও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও স্নেহ ভগ্নির কোন উত্তর না পাইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—সে তাড়াতাড়ি চিঠি-খানা তুলিয়া লইল। স্বর্ণ তখনও প্রদীপ লইয়া সেইখানেই দাড়াইয়া-ছিল, স্নেহ সেই প্রদীপের আলোয় বেশ একটু সুস্পষ্ট স্বরে সেই চিঠিখানা পাঠ করিতে লাগিল,—

কনক!

পিসিমা যে তোমাকে রোগ শয্যায়,—যখন তুমি মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে তখন তোমায় তোমার পিতার নিকট ফেলিয়া আসিয়াছে,—আজ তিন দিন হইল বাড়ী ফিরিয়া আমি প্রথম সে

সংবাদ অবগত হইয়াছি। যে নেষায় এতদিন আমি বিভোর হইয়াছিলাম,—যাহাতে আমার মনুষত্ব পর্য্যন্ত ডুবিতে বসিয়াছিল সে নেষা আমার এত দিনে কাটিয়াছে। নেষা কাটিল বটে কিন্তু এক্ষণে আমি একেবারে পথের ভিখারী। পিসিমা আমার যথা সর্ব্বস্ব লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন,—অনেক অনুসন্ধানেও আমি তাঁহার কোন সন্ধানই করিতে পারি নাই। আজ তিন দিন যে আমার কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা আর লিখিয়া তোমার প্রাণে কষ্ট দিব না। অনেক পাপ করিয়াছি, তোমার ন্যায় সরলাকে বিবাহ করিয়া একদিনের জন্যও ফিরিয়া দেখি নাই ভগবান তাহারই বোধ হয় সাজা আমাকে প্রদান করিতেছেন। তাঁহার রাজ্যে পাপের ফল ভুগিতেই হইবে।

আমি তোমাকে দেখিতে যাইব ভাবিয়া দুই তিনবার তোমাদের বাড়ীর নিকট দিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তোমাদের বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে পারি নাই। ঢুকিবার মুখও আর আমার নাই, আমি তোমার সহিত ও তোমার পিতার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে আর তাঁহাদের সম্মুখে আমার মুখ দেখান উচিত নয়। তিন দিন একরূপ অনাহারে কাটাইয়া বহুকষ্টে একটী চাকরী পশ্চিমে জুটাইতে পারিয়াছি। আমি আজ রাত্রেই সেইখানে রওনা হইব। যদি জীবিত থাক,—এবং যদি আমিও জীবিত থাকি,—যদি কোন দিন ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইবার

উপযুক্ত হই তবেই আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, নতুবা এই শেষ। স্ত্রী স্বামীর শত অপরাধ ক্ষমা করে, পার যদি তুমিও আমায় ক্ষমা করিও। ইতি:—

তোমার হতভাগ্য স্বামী—
উগ্রপ্রকাশ।

চিঠিখানা পাঠ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই একটা দীর্ঘশ্বাস স্নেহের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের ভিতর একেবারে কতকগুলো কথা ঘা দিয়া উঠিল;—মানুষের মতি ফিরিতে এক মুহূর্ত্তও সময়ের প্রয়োজন হয় না, হয়তো কনক একদিন সুখী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার জীবনের সমস্ত সুখই ফুরাইয়া গিয়াছে। মহাকাল তাহার সকল সুখে বাধ সাধিয়াছে। কনক সেই আশায় আবার বুক বাঁধিয়া দিন কাটাইতে পারে, কিন্তু তাহার আশাটুকু পর্য্যন্ত করিবার কিছুই নাই। স্নেহ এই সকল চিন্তার ভিতর ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিল;—সহসা জননীর স্বরে সে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল।

মহিমবাবু তখনও বাড়ী ফেরেন নাই,—কাজেই আনন্দময়ীর নিদ্রাটাও একেবারে জমাট বাঁধিতে পারে নাই। সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি নিদ্রা জড়িত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি কন্যাদের

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের বাবা এখন ফেরেননি রে! রাত কটা,—এখনও কি রাত্রি বেশী হয়নি। তোরা তিন জনে মিলে ওখানে পিদীপ নিয়ে কি করছিস্?"

স্নেহ উত্তর দিল, "মা জামাইবাবু কনককে পত্র লিখেছে।"

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন; বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহা তা লিখ্‌বে না, হাজার হক্ ব্যাটাছেলে লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞান বুদ্ধি হ'য়েছে নিজের স্ত্রীর সংবাদ না নিয়ে কি থাকতে পারে? কি লিখেছে,—ভালো আছে তো?"

স্নেহ পত্রের মর্ম্মটুকু জননীকে বুঝাইয়া দিল। পত্রের ভাবার্থ-টুকু শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দময়ীর মুখখানি একেবারে ম্লান হইয়া গেল, তিনি অতি করুণস্বরে বলিলেন, "তা বাছা এখানে এলেই তো পারতো। মার কাছে কি ছেলের কোন অপরাধ আছে! পৃথিবীতে থাকতে গেলে দোষ অপরাধ কার না হয়! তা'বলে কি কেউ আসে না। কোথায় যাচ্ছে তা কিছু লিখেছে?"

স্নেহ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না মা তা'কিছু ঠিকানা লেখেনি। শুধু আমি পশ্চিমে চাকরী কর্ত্তে যাচ্ছি এইটুকু লিখেছে।"

"তা না এসেছে, না এসেছে, বাছা আমার বেঁচে থাক।" আনন্দময়ী কনকের দিকে ফিরিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "নে

কনক ভাবিস্‌নি, আমি বল্‌ছি তুই একদিন না একদিন ওই স্বামী নিয়েই সুখী হ'তে পার্‌বি।"

কনক কোন কথা কহিল না, একবার চকিতের জন্য মার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বালিশে মুখ লুকাইল। আনন্দময়ী কি আবার বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বাহিরে সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠায় তিনি আর কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। স্বর্ণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা না মা, বাহিরের দরজাটা খুলে দিয়ে আয়, উনি বোধ হয় এসেছেন। বাহিরে আলো নেই, এই আলোটা না হয় নিয়ে যা।"

স্বর্ণ কোন কথা কহিল না। প্রদীপটি হাতে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। অন্ধকার গৃহে মাতা ও কন্যাদ্বয় নীরবে বসিয়া রহিলেন। দুই মিনিট অতিবাহিত হইতে না হইতে স্বর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া মহিমবাবু সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আলোর অভাবে ঘরখানার যেন জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, স্বর্ণ আলো আনিবা মাত্র সেখানা যেন আবার ধড়পড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। মহিমবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখন কেউ খাওনি, এত রাত্রি পর্য্যন্ত আমার জন্যে বসে আছ? যাও যাও খাওগে যাও রাত অনেক হয়েছে। আমায় পরেশনাথের মা কিছুতেই ছাড়লেন না,—কাজেই খেয়ে আস্‌তে হ'লো?"

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বুঝি পরেশ-নাথদের বাড়ী গেছলে? পরেশনাথের বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হ'লো? তিনি কি বল্‌লেন?"

পত্নীর কথায় একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া মহিমবাবু বলিলেন, "সে অনেক কথা,—তোমরা খেয়ে এস তারপর সব শুন্‌বে অথন।"

আনন্দময়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কন্যাদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "চ' স্নেহ, চ' স্বর্ণ খাবি চ'। সত্যিই রাত অনেক হ'য়েছে।"

আনন্দময়ী কন্যাদ্বয়কে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া বলিলেন, "উগ্রপ্রকাশ কনককে একখানা চিঠি লিখেছে। স্বর্ণ চিঠিখানা ওঁকে দিয়ে যা। চিঠিখানা পড়ে দেখ তার বোধ হয় মতিগতি একটু ভালো হ'য়েছে।"

মহিমবাবু কোন কথা কহিলেন না। চিঠিখানা কনকের মস্তকের বালিসের নিম্নে ছিল, স্বর্ণ সেখানা তথা হইতে বাহির করিল পিতার হস্তে সেখানা প্রদান করিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মহিমবাবু পকেট হইতে চশমাখানা বাহির করিয়া নাসিকার উপর স্থাপন করিলেন, তাহার পর প্রদীপের নিকট যাইয়া পত্রখানা ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি একবার দুইবার তিনবার, বার বার পত্রখানা পাঠ করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতে

পারিলেন না। পত্রখানা পাঠ শেষ করিয়া সেখানাকে যথাস্থানে রাখিয়া চশমাখানা নামাইলেন। তিনি জামাটা খুলিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া সেই প্রদীপের সম্মুখে বসিয়াই আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার চিন্তার অন্ত ছিল না,—একটার পর একটা চিন্তা আসিয়া তাহাকে পাগল করিবার চেষ্টায় ছিল। এতদিন যে তিনি কেন পাগল হন নাই তাহাতেই তিনি মনে মনে বেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া উঠিতে ছিলেন, সেই সময় স্নেহ আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। মহিমবাবু তাহার দিকে মুখটা তুলিয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মধ্যে তোর মা খাওয়া হয়ে গেল? কি খেলি? আজ বুঝি তোর জন্যে দু'খানা লুচিও ভাজা হয়নি? আর হবেই বা কোথেকে যে পয়সা কড়ির টানাটানি।"

স্নেহ মৃদু হাসিয়া বলিল, "না বাবা রাত্রে লুচি খেলে আমার বড় অসুখ করে, তাই আজ মাকে লুচি ভাজতে বারণ করে ছিলুম।"

মহিমবাবু কোন কথা কহিলেন না। স্নেহের জীবন ব্যাপি দুঃখের কথা ভাবিয়া তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে আনচান করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে এক ফোটা অশ্রু তাহার চোখের কোনে আসিয়া জড় হইল। তাঁহার বড় আদরের জ্যেষ্ঠ কন্যা,—তিনি কত আশা করিয়া তাহার বিবাহ দিয়া ছিলেন কিন্তু ভগবান বাদ

সাধিয়াছেন। দুই দিনেই তাহার সকল সাধ আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। আনন্দময়ী ও স্বর্ণের গৃহ প্রবেশের শব্দে তিনি আবার দ্বারের দিকে চাহিলেন। আনন্দময়ী গৃহ প্রবেশ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা পরেশনাথদের বাড়ী গেছলে কিন্তু তাঁরা কি বল্‌লে না বল্‌লে কিছুইতো বল্‌লে না! স্বর্ণের বিয়ের কিছু কথাবার্ত্তা হ'লো!"

আশা ও নিরাশার ভিতর আনন্দময়ীর প্রাণটা তখন নৃত্য করিতেছিল,—তিনি কথাটা শেষ করিয়া ব্যাকুল নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। মহিমবাবু গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "স্বর্ণের বিয়ের কথাও হ'লো বটে! কিন্তু তোমরা যা আশা কচ্ছো তা হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। পরেশনাথের বিয়ে এক জায়গায় এক রকম পাকাপাকিই হয়ে গেছে। যে ভদ্রলোকটির মেয়ের সঙ্গে পরেশনাথের বিয়ে স্থির হয়েছে, আমি যখন পরেশনাথদের বাড়ী গিয়ে পৌঁছুলুম তিনিও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার মেয়ের বিয়েতে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। যারা আমাদের এত উপকার করেছে তাদের কি এত টাকা ক্ষতি করা আমাদের উচিত। পরেশনাথের খুব ইচ্ছে সে স্বর্ণকে বিয়ে করে কিন্তু আমি তাদের এত টাকা কিছুতেই ক্ষতি করে দিতে পারিনি! আমি তার পিতাকে প্রাণ খুলে বলে এসেছি, আপনি আপনার ছেলের যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দিতে পারেন, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আনন্দময়ীর মুখখানি একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। স্বর্ণ এক পার্শ্বে বসিয়াছিল তাহারও কর্ণে পিতার কথাগুলো প্রবেশ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র বালিকা যে সোণার ঘর প্রাণের ভিতর আপনার মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল, পিতার কথায় তাহা যেন একেবারে ধসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রদীপের আলোটুকুও তাহার চক্ষের সম্মুখে একেবারে ঝাপসা হইয়া আসিল। মহিমবাবু বলিতে লাগিলেন, "যেটুকু তাঁরা করেন সেইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। পরেশনাথের বাবা বলেছেন, স্বর্ণের বিয়ে তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেবেন, তার সমস্ত ব্যয় তাঁর। তিনি যে এই টুকু করবেন বলেছেন এই আমাদের যথেষ্ট। আমরা গরীব আমাদের গরীবের মতই আশা করা ভালো।"

আনন্দময়ী কথা কহিলেন না। একটা ক্ষীণ দীর্ঘ নিশ্বাস যেন তাঁহার প্রাণের সমস্ত বেদনা টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। একটা অব্যক্ত বেদনায় স্বর্ণের চোখের কোলে এক ফোঁটা জল আসিয়া জমিয়া ছিল, অন্যে দেখিবার পূর্ব্বেই সে তাড়াতাড়ি তাহা মুছিয়া ফেলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শম্ভুনাথবাবু সে দিন তাঁহার চাউলের আড়তে গিয়াছিলেন,—আড়তে প্রত্যহ তিনি যাইতেন না, সপ্তাহে কেবল এক দিন মাত্র যাইতেন। তিনি যখন আড়ত হইতে ফিরিলেন তখন অপরাহ্ণ চার ঘটিকা। তিনি সবেমাত্র অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাপড় জামা ছাড়িয়া পালঙ্কের উপর একটা তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় সহসা শ্যামাসুন্দরী আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শম্ভুনাথবাবুর দৃষ্টি পত্নীর মুখের উপর পতিত হইল। শ্যামাসুন্দরীর মুখ চোখের উপর আজ বেশ একটু ক্রোধের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নথের ভিতর দিয়া সে বাহারটা আজ যেন তাঁহার বেশ একটু নূতন ঠেকিল। শম্ভুনাথ-বাবু তাকিয়াটা ঠেস্ দিয়া বেশ একটু জুত করিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি ব্যাপার কি গো,—আজ যে একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকছ। অনেক দিনের কথা সে সব ভুলেই যাওয়া গেছে। ঝগড়া বিবাদ গুলো তো তুমি বহুকালই ছেড়ে দিয়েছ। আজ যা তোমার বাহার হয়েছে যেন সেই সাবেক কালের চেহারাটা আমার চোখের উপর একেবারে জ্বল জ্বল করে উঠ্ছে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পুত্রের মলিন মুখ আজ কয়েকদিন হইতে ক্রমাগত দেখিয়া দেখিয়া শ্যামাসুন্দরীর প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়া ছিল, স্বামীর কথাগুলা তাঁহার সর্ব্ব শরীরে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল, তিনি বেশ একটু কুপিত কণ্ঠে বলিলেন, "বলি রসতো খুব বাড়ছে এদিকে যে মরবার বয়স হ'লো তার কি কোন হুস্ আছে। সাত নয় পাঁচ নয় একটি মাত্র ছেলে সে ভেবে ভেবে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে তো একটুও খেয়াল নেই, নিজের নিয়েইতো বেশ মত্ত হয়ে আছ। ছি ছি তোমার একটু ঘেন্নাও করে না।"

শম্ভুনাথবাবু চোখ দুইটা বড় করিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, মাথাটা নাড়িয়া গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ছেলে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে নাকি গো। তা যাবারই কথা। মানুষের জীবনের ওই বয়সটা বড় পাজি। ওই বাইস্ থেকে তিরিশ বড় সাংঘাতিক জায়গা। যেমন বৈতরণী পার না হ'লে স্বর্গে যাওয়া যায় না, সেই রকম ওই বাইশ থেকে তিরিশ পার না হ'তে পারলে কিছুতেই আর মানুষ হওয়া যায় না। এই সময় জীবনের হালটা একটু বেশ চেপে ধরা দরকার, একটু আল্‌গা হয়েছে কি অমনি ভরা ডুবি। আরে আমাদেরও কি ও বয়সে একটু আন্‌চানানি ধরে নি,—ধরে ছিল কিন্তু হালটা বেশ কসে ধরা ছিল বলে আর বানচাল হতে হয়নি।"

শ্যামাসুন্দরী মহা বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "বানচাল হতে হয়নি

ফয়নি তোমার ও ঘ্যানঘ্যানানি আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আমার একটি ছেলে তার দিন রাত্ত মুখ শুকনো দেখলে কি আর মায়ের প্রাণ বাঁচে,—না মুখে অন্ন দিতে ইচ্ছে করে? না বাপু আমার আর ভাল লাগে না তুমি যা হয় শিগগির এর একটা ব্যবস্থা কর।"

শম্ভুনাথবাবু পত্নীর কথার উত্তরে বলিলেন, "তোমার একটি ছেলে, আর আমার কি পাঁচটি? আমারও ওই একটিই ছেলে তো গো। মায়ের প্রাণ বাঁচে না, বাপের ও কি প্রাণ কি খুব চাঙ্গা থাকে,—তাতো নয় গো। তবে কি জান তোমার ছেলেইতো এর ভেতর ওই এক ফ্যাসাদ ঢুকিয়ে যত গোলযোগ ঘটিয়েছে, নইলে কি আর দেরী হয়। কোন কালে তোমার ছেলের ওই শুকিয়ে যাবার খুব ভালো অষুধ এনে দিতুম। ভালো কথা মনে করেছ সেই মেয়েটার পনোর দিনের ভেতর বিয়ে দিয়ে দেব বলেছি তারওতো আজ বার দিন যায়। ওরে কে আছিস্ শিগগির একবার সরকার মশাইকে পাঠিয়ে দে।"

ভৃত্য দ্বারের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল বাবুর আদেশ পাইবা মাত্র সে সরকার মহাশয়কে ঢাকিবার জন্য বাহির বাটীর দিকে ছুটিল। শ্যামাসুন্দরী নথটা নাড়িয়া বেশ একটু করুণ স্বরে বলিলেন, "এই টাকা, টাকা করেই দেখছি শেষ তুমি পাগল হয়ে যাবে। এক ছেলে তার বিয়েতেও সেই টাকা, টাকা, টাকা। টাকা কি তোমার

সঙ্গে যাবে! তোমার মত এমন টাকা পিশাচ লোক জগতে আর একটীও নেই। মেয়েটি ভালো, ছেলের পছন্দ কিন্তু তাহ'লে কি হয়; তারা যখন গরীব টাকা দিতে পারবে না তখন আর সেখানে ছেলের বিয়ে দেওয়া হবে না। মরবার সময়েও তোমার মুখে ভগবানের নাম বেরুবে না, ওই টাকা টাকা করেই মর্ত্তে হবে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, তাহ'লেতো ভালই হয় গো, —আমাদের শাস্ত্রে আছে মরবার সময় যা মনে করে মানুষ মরে পরের জন্মে তাই হয়।"

শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বাধা দিয়া বলিলেন, "তা তুমি টাকাই হবে, লোকে নিতে আছড়াবে দিতে আছড়াবে। সে যাক আর মিছে গোলমাল করো না, তুমি সেই মেয়েটির সঙ্গেই পচুর বিয়ে দাও। ছেলের বিয়েতে টাকা নিলে সে টাকা থাকে, না সে টাকাতে কেউ বড় মানুষ হয়।"

পত্নীর কথায় শম্ভুনাথবাবুর মুখখানা বেশ একটু বিকৃত হইয়া গেল,—তিনি পত্নীর মুখের সম্মুখে হাতখানা নাড়িয়া বলিলেন, "আহা আবার গোল কর কেন সে সব কথাতো চুকে বুকে গেছে। যা কিছু গোলমাল দর দস্তুর সে সব ওই প্রথম মুখেই হয় একবার কথা পাকাপাকি হয়ে গেলে তা আর নড়ন চড়ন হবার জোটি নেই; তাতে তোমার হাজার লোকসানই হক, আর তুমি উচ্ছন্নই যাও। কথা যখন চুকে বুকে গেছে তখন আবার অব্যবসায়ীর মত

গোলমাল বাধাও কেন? ও গোলমাল তো তোমার আইনে টিক্‌বে না।”

শ্যামাসুন্দরী কি আবার বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সরকার মহাশয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া মুখখানা ভার করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সরকার মহাশয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া শম্ভুনাথবাবু তাকিয়াটাকে টানিয়া বেশ করিয়া জুত করিয়া বসিলেন। সরকার মশাই পালঙ্কের নিকটে আসিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, “হুজুর কি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন?”

শম্ভুনাথবাবু একবার একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সরকার মহাশয়ের দিকে মুখটা তুলিয়া বেশ একটু রুক্ষ স্বরে বলিলেন, “আজ্ঞে হাঁ আপনাকে ডেকে পাঠান হয়ে ছিল। বলি চাক্‌রী বাক্‌রী করবার বুঝি আর ইচ্ছে নেই, বেশ দু’পয়সা বুঝি গুচিয়ে নেওয়া হয়েছে? ব্যাপারিদের সঙ্গে অত ফুস্‌ফাস্‌ কথা, বুঝি না কি আর বুঝি সব। তা বেশ হয়েছে এখন আমায় কবে পরিত্রাণ দেবেন সেটা শুন্‌তে পেলেই যে আমি নিশ্চিন্ত হই।”

সরকার মহাশয় আজ বিশ বৎসর শম্ভুনাথবাবুর নিকট কাজ করিতেছে কিন্তু তবুও সে বাবুর মেজাজটা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। বাবুর কথায় সে একেবারে অবাক হইয়া বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বাবুর মুখে আজ এ কি কথা! কোন

খানটায় যে তাহার অন্যায় হইয়াছে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শম্ভুনাথবাবু বলিতে লাগিলেন, "বলি যদি কাজই আমার না হ'লো তখন শুধু শুধু মাসে মাসে এক কাড়ি করে টাকা তোমায় দিয়ে তো আমার চতুর্ভুজ হবার দরকার নেই। আমার বাড়ীটা তো আর অতিথিশালাও নয় আর আমিও তো একেবারে দাতাকর্ণ হয়ে বসিনি।"

সরকার মহাশয় মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে অতি বিনীত স্বরে বলিল, "আজ্ঞে কাজে কোন খানটায় গাফিলী হয়েছে তাহাতো ঠিক বুঝতে পারছিনি—"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "ওসব ন্যাকাম কল্লে কি আর আমাদের কাছে পরিত্রাণ আছে, মুখখানা দেখলেই যে আমরা সব বুঝতে পারিগো। কাজে কোথায় গাফিলী হ'চ্চে বুঝতে পাচ্ছ না, বুঝিয়ে দিচ্চি তাহ'লেই বুঝতে পারবে। আমি যে একটি পাত্রের সন্ধান কর্ত্তে বলে ছিলুম সেটা বুঝি গরীবের কথা বলে আর কাণে করনি। এ রকম কল্লে কি আর চাকরী করা চলে? যে টাকা দেবে সে শুনবে কেন। এক একটি টাকা এক একপো রক্ত। আমার বুকের রক্ত দিয়ে তোমায় বসিয়ে রেখে কি তোমার শরীর পুষ্টি করাবো?"

বাবু ক্রমাগত বলিয়া চলিয়াছেন, সরকার মহাশয় উত্তর দিবার পর্য্যন্ত ফাঁকটুকু পাইতে ছিল না। শম্ভুনাথবাবু নীরব

হইবা মাত্র সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে সেতো সব ঠিকই হ'য়ে গেছে। আমি সেইদিনই গোপাল ঘটকের কাছে গেছ্‌লুম। পাত্রের বাপ নেই, মা আছেন, বড় ভাই আছেন। কাল সকালে পাত্রের বড় ভাই মেয়ে দেখ্‌তে যাবেন।"

শম্ভুনাথবাবু কাণ পাতিয়া সরকার মহাশয়ের কথাগুলা শুনিতেছিলেন বলিলেন, "তা সে খবরটাওতো আমায় দিতে হবে সে খেয়ালটুকুও তো করা উচিত ছিল। আমি যে একটা গরীব একপাশে পড়ে আছি সেটা একটু আধ্‌টু খেয়াল ক'রো।"

সরকার মহাশয় মহা কিন্তুস্বরে উত্তর দিল, "এমন কথা বলবেন না। আপনি আমার অন্নদাতা মনিব, বাপ মার সমান, আজ বিশ বৎসর আপনার—"

শম্ভুনাথবাবু হাতটা নাড়িয়া সরকার মহাশয়কে বাধা দিয়া বলিলেন, "বাস, বাস খুব বলা হয়েছে এখন শুনি তারা বরাবর সেখানে যাবেন না এ গরীবের বাড়ীতে পদধূলি দেবেন। আমাকেও যেতে হবে কি না সেইজন্যে জিজ্ঞাসা করা।"

সরকার মহাশয় হাত দুইটা কচ্‌লাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞে না, তারা এখানে প্রথম আসবেন তারপর আপনাকে তুলে নিয়ে এখান থেকে মেয়ে দেখতে যাবেন, সেই রকমই কথাবার্ত্রা ঠিক করেছি।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "তা বেশ করেছ, এখন একবার

ছোটবাবুকে ডেকে দিয়ে যাও দেখি। তিনি আবার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন কেন, তার আবার একটা তত্ত্ব নিয়ে দেখি।"

"যে আজ্ঞে," বলিয়া সরকার মহাশয় বিদায় হইলেন। "ওরে কে আছিস্ এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যা," বলিয়া শম্ভুনাথবাবুও তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া আড় হইয়া পড়িলেন।

সরকার মহাশয়ের মুখে পিতা ডাকিতেছেন শুনিয়া পরেশনাথ পিতার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শম্ভুনাথবাবু পালঙ্কের উপর আড় হইয়া পড়িয়াছিলেন, পুত্রকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আবার পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গর্ভধারিণীর মুখে শুন্‌লেম তুমি নাকি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ! যদি এ বয়সে এ রকম দিন দিন শুকিয়ে যাও তাহ'লে বাঁচবে ক'দিন। যাও না হয় দিন কতক একটা ভালো জায়গায় থেকে শরীরটাকে একটু ফিরিয়ে নিয়ে এস। তোমার ভাববার যেটুকু ছিল সে ভার যখন আমি নিয়েছি, মহিমবাবুর মেয়ের বিয়ের ভার যখন আমার ওপর, তখন আর তোমার ভাববার কি আছে বলো? বাপের কথায় একটু বিশ্বাস করো। গোলমাল যা কিছু ওই প্রথম মুখে, আমরা ব্যবসা করে খাই, একবার কথা দিলে তার আর নড়চড় হবার জোটি নেই।"

পরেশনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া পালঙ্কের ছত্রী ধরিয়া

দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রাণের ভিতর সুখ বলিয়া একটা জিনিষ আজ কয় দিন ধরিয়া একেবারেই ছিল না। তাহার প্রথম যৌবন যখন আনন্দের ভিতর দিয়া জাগিয়া উঠিতে ছিল,—সেই শুভ মুহূর্ত্তে স্বর্ণ আসিয়া তাহার রূপের জ্যোতি ছড়াইয়া বুকের ভিতর প্রথম যে দাগ টানিয়াছে, সে দাগ কি পিতার একটী কথায় মুছিতে পারে! কাহারও কি কোন দিন মুছিয়াছে! কালের প্রলেফ খাইয়া, কর্ম্মের বোঝায় চাপা পড়িতে পারে, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেই পারে না। মরণের দিন পর্য্যন্ত সুযোগ পাইলেই সেটা নড়িয়া চড়িয়া বুকের ভিতর ঘা মারিতে বিস্মৃত হয় না। পিতার কথার উত্তরে পরেশনাথ মৃদুস্বরে বলিল, "শরীর যে আমার বিশেষ খারাপ হয়েছে তা ব'লেতো আমার বোধ হয় না। মা যে কেন আমি শুকিয়ে যাচ্ছি বলেছেন, তাতো বল্‌তে পারিনি। আর মহিমবাবুর মেয়ের বিয়ের ভার যখন আপনি নিজে নিয়েছেন, তখন তাতে আমার বল্‌বারতো আর কিছু নেই।"

কলিকা ফুঁ দিতে দিতে ভৃত্য আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। শম্ভুনাথবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তবু ভালো যে এক কল্‌কে তামাক নিয়ে এসেছ। আমি ভেবেছিলুম বুঝি চাকর মহলে কলেরা হয়েছে। সব ব্যাটাই মারা গেছে।"

ভৃত্য কোন কথা কহিল না, সে নীরবে আসিয়া কলিকাটা

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গুড়গুড়ির উপর বসাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। কলিকার তাম্রকূট তখনও ধরিয়া উঠিতে পারে নাই, শম্ভুনাথবাবু নলটায় বৃথা কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু তুমি আমার এক ছেলে, তোমার বিয়েতে যে আমার টাকা না নিলে বিশেষ কিছু এসে যায় তা নয়। বাবা যা রেখে গেছ্‌লেন তাই বুঝে চল্লে তিন পুরুষ পায়ের উপর পা দিয়ে বসে চল্‌তো; আমি আবার সেই টাকা নেড়েচেড়ে তার চারগুণ টাকা করেছি। আর তুমি যদি বুঝে সেটা নাড়তেচাড়তে পার তাহ'লে সেটা আট গুণে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় তোমার বিয়েতে কিছু না নিলে যে বিশেষ কিছু এসে যাবে তা নয়। কিন্তু ছেলের বিয়েতে টাকা না নিয়ে আমি একটা খবরের কাগজে হইচই বাধাতে চাইনি। তোমার প্রপিতামহ, তোমার পিতামহ, তোমার পিতা যখন সকলেই টাকা নিয়েছেন, তখন তুমিই বা না নেবে কেন? তাঁরা যে পথে গেছেন তোমারও সেই পথেই যাওয়া উচিত। আমি যদি গরীব হতুম তাহ'লে কোন কথা ছিল না,—তোমার বিয়েতে টাকা নিই আর না নিই তা কেউ খেয়ালই কর্‌তো না; কিন্তু ওই যে বড়লোক হয়েই সব গোল করেছে। তোমার বিয়েতে টাকা না নিলে কি হবে জান, বাড়ীতে তিষ্ঠনো ভার হবে। আমায় সবাই উদার হৃদয় দাতাকর্ণ ভাব্‌বে, বাড়ীর দোরে একবারে কুড়ের গাঁদি লেগে যাবে। তখন লোক তাড়াবার জন্যে আবার

দশজন দরওয়ান বাহাল কর্ত্তে হবে। টাকা খরচ, অশান্তি সে এক মহা ফ্যাসাদ।"

পরেশনাথ অতি ধীরস্বরে উত্তর দিল, "আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন, তাতে আমার জিজ্ঞাসা করবার কি আছে?"

শম্ভুনাথবাবু পুত্রকে বাধা দিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করার কিছু ছিল না, অপরে আমায় যা ভাবে ভাবুক তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। তুমি আমার একমাত্র ছেলে, তুমি আমায় পাছে ভুল বোঝ,—পাছে ভাবো বাবা টাকার লোভে আমার পছন্দ মত মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে না। তাই এত কথা বলা। সংসারে থাকতে গেলে মানুষের যে সব ইচ্ছেই পূর্ণ হবে তার কোন মানে নেই; আর তা বোধ হয় ভগবানেরও ইচ্ছে নয়। একজনা কাল মহিমবাবুর মেয়েটিকে দেখ্‌তে যাবে, আমিও সঙ্গে যাব। যদি তাদের মেয়ে পছন্দ হয়,—না হবার তো কোন কারণ নেই, তাহ'লে কালই তার বিয়ে আমি পাকা করে ফেলবো, সেজন্যে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ছেলে যে বাপের কত স্নেহের পাত্র যখন ছেলে হবে তখন বুঝতে পারবে। এ অবস্থায় ছেলে যদি বাপকে না বুঝতে পারে, আর বাপ যদি ছেলেকে না বুঝতে পারেসেটা বড়ই দুঃখের কথা।"

পরেশনাথ পিতার কথায় আর কোন উত্তর দিল না, একটা দীর্ঘনিশ্বাসে আশার ক্ষীণ প্রদীপটুকু পর্য্যন্ত নিবিয়া গেল। ভূমি-

কম্পে প্রকাণ্ড অট্টালিকা যেমন করিয়া টলিয়া উঠে—ঠিক তেমনি করিয়া যেন তাহার সমস্ত প্রাণটা টলিতে লাগিল। সমস্ত জগৎ তাহার চক্ষুর সম্মুখে একটা ছায়াছবির মত হইয়া পড়িল। সে নীরবে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্বর্ণকে একদল লোক যে প্রত্যূষে দেখিতে আসিবে সে সংবাদটা শম্ভুনাথবাবুর নিকট হইতে মহিমবাবু রাত্রেই পাইয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র বৈঠকখানাটিকে প্রভাতে উঠিয়াই একটু ঝাড়িয়া মুছিয়া চকচকে করিয়া তুলিয়া ছিলেন। জরাজীর্ণ যে তক্ত-পোষ খানি বৈঠকখানা গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত সেখানাকে বাহির করিয়া উঠানের মাঝে রাখিয়া সমস্ত ঘরটাতে একখানা সতরঞ্চি পাতিয়া তাহার উপর একখানা পরিস্কার চাদর বিছাইয়া রীতিমত একটা ফরসা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বহুকালের একটী গুড়গুড়ি ছিল, সেটা হতাদরে পড়িয়া পড়িয়া লজ্জায় নিজের মুখে নিজেই যেন চুন কালি মাখিয়া স্বরূপ চেহারাটাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়া ছিল। আজ সেটাকে বার পাঁচ সাত ঝামা দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া তাহাকে কতকটা ভদ্রসমাজে বসিবার মত করিয়া তিনি সেটাকে ফরাশের মধ্যস্থলে বসাইয়া রাখিয়া ছিলেন গোটাদুই থেলো হুকোও জল ফিরাইয়া এক পার্শ্বে রাখিতে ভুলেন নাই। কয়েকটা কলিকাও সাজিয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া ছিলেন। প্রত্যূষ হইতে মহিমবাবু যেমন গুড়গুড়িটা লইয়া পড়িয়াছিলেন, ভিতরে

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্নেহও সেইরূপ স্বর্ণকে লইয়া পড়িয়াছিল। সকাল হইতে তাহার রূপটাকে চকচকে করিয়া তুলিবার জন্য সকল চেষ্টাই চলিতে ছিল।

বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে, মহিমবাবু তাঁহার বৈঠকখানার সেই সদ্য রচিত ফরাশের উপর পড়িয়া ব্যাকুলভাবে শম্ভুনাথবাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। পাত্রের দলের এখনও দেখা নাই। সূর্য্যের কিরণ বেশ প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে, বেলাও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বেলা যতই বাড়িয়া উঠিতেছিল, মহিম-বাবুর উৎকণ্ঠাটাও ততই বাড়িয়া যাইতেছিল। শম্ভুনাথবাবু সংবাদ দিয়াছিলেন যে, তিনি অতি প্রত্যুষেই পাত্রের দলবল লইয়া তাঁহার বাড়ী উপস্থিত হইবেন, কিন্তু এত বেলা হইল তবু তাঁহার দেখা নাই কেন! তবে কি পাত্রের দল এখনও উপস্থিত হইতে পারে নাই,—না কোনরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে। মহিমবাবুর কন্যার বিবাহ, কাজেই তাঁহার চিন্তাটাও অধিক। তাঁহার মনে হইতে ছিল সমস্ত বেলাটাই যেন বায়োস্কপের ছবির মত দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। আজকে যেন সেটা আর কিছুতেই দাঁড়াইতে চাহিতেছে না। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল ততই মহিমবাবুর প্রাণটা যেন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি আর কিছুতেই ফরাশের উপর শুইয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না, একবার বসিতে ছিলেন, একবার শুইতে ছিলেন, কখন কখন বা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফরাশের উপর পায়চারী করিতেছিলেন। সেই সময় শম্ভুনাথবাবুর

জুড়ি গম্‌গম্‌ করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র বাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। দরজার সম্মুখে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া মহিমবাবু তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা গৃহ হইতে বাহির হইয়া সদর দরজার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ীতে তিনজন লোক আসিয়াছিল, শম্ভুনাথবাবু, ঘটক ও পাত্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। মহিমবাবু তাঁহাদের মহা সমাদরে গাড়ী হইতে নামাইয়া আনিলেন। শম্ভুনাথবাবু আজ তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে? যে পরেশনাথ তাঁহার বিপদ নিজের বিপদের মত করিয়া মাথা পাতিয়া লইয়াছে, তাহারই পিতা আজ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন, —এ আনন্দ কি তাঁহার রাখিবার স্থান আছে? তিনি তাঁহাকে কোথায় বসাইবেন কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। পাত্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে তাঁহার কন্যাকে দেখিতে আসিয়াছে, সে কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শম্ভুনাথবাবুকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শম্ভুনাথবাবুর কথায় তাঁহার সেটা যেন স্মরণ হইল। শম্ভুনাথবাবু বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিয়া, ফরাশের উপর বসিতে বসিতে পাত্রের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মহিমবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইনিই হলেন পাত্রের বড় ভাই, এরই ছোট ভায়ের

সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে স্থির করেছি। আমরা ব্যবসায়ী লোক বুঝলেন মহিমবাবু ওই প্রথম মুখেই যা গোলমাল একবার কথা দিলে আর নড়নচড়ন নেই। আপনাকে বলেছিলুম যে পনোর দিনের মধ্যে আপনার মেয়ের বিয়ে অবধারিত, আজ তের দিন হয়েছে কাল বাদে পরশু আপনার মেয়ের বিয়ে অকাট্য। আর দেরী করবার প্রয়োজন নেই, মেয়ে নিয়ে আসুন, বাবুর পছন্দ হ'লেই দেনা পাওনাটা মিটিয়ে ফেলি। আপনার রূপও না থাকতে পারে, কিন্তু মেয়ের রূপ যথেষ্টই আছে, অপছন্দ হবার কোন কারণই নেই।"

তখন সকলে আসিয়াই ফরাসের উপর বেশ জাঁকাইয়া বসিয়া ছিল। মহিমবাবু অতি বিনীতস্বরে বলিলেন, "আপনি মহাত্মা লোক আপনি আমাকে যে অনুগ্রহ করলেন তা মুখে জানান যায় না। নিজের ছেলে যা করে না আপনার ছেলে আমার তার চেয়েও ঢের বেশী করেছে, তার ঋণ শোধ হবার নয়।"

এক পার্শ্বে কয়েকটা কলিকা সজ্জিত ছিল, ঘটক মহাশয় তাহারই একটায় অগ্নি সংযোগ করিয়া একটা থেলো হুকার উপর কলিকাটা বসাইয়া আগুনটাকে বেশ একটু জাকাইয়া তুলিবার জন্য ফু দিতে ছিল। মহিমবাবু নীরব হইবা মাত্র সে চরকির মত মাথাটা ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "অনুগ্রহ বলে অনুগ্রহ বাবুর অনুগ্রহে কত ব্যাটা গাড়ী জুড়ি হাকাচ্ছে। বাবু যখন আপনার

কন্যার বিবাহের ভার গ্রহণ করেছেন তখন কি আর প্রজাপতির স্থির থাকবার উপায় আছে, তার ডানা একেবারে ঝটপট করে নড়ে উঠেছে, এমনি কমলার মাহাত্ম্যই বটে। মার চরণে শত কোটি প্রণাম।"

মহিমবাবুও একটা কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলেন, তিনি সেটা গুড়গুড়িটার উপর বসাইয়া দিয়া একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে যাইতেছিলেন; শম্ভুনাথবাবু তাহার নলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আমার জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই, যান যান আপনি আপনার মেয়ে নিয়ে আসুন। কাজটা মিটে যাক আপনিও নিশ্চিন্তি হন, আমিও নিশ্চিন্তি হই।"

মহিমবাবুর একটা কি বলিবার জন্য ঠোঁট দুইটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুনাথবাবু হাতটা নাড়িয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "কথাবার্ত্তা যা কিছু সব পরে। নিন মশাই আপনি উঠে পড়ুন, কাজ যত শিগ্‌গির মিটে যায় ততই মঙ্গল।"

বলিবার মত অনেক কথাই মহিম বাবুর কণ্ঠনালিতে আসিয়া ভীড় জমাইয়া ছিল, কিন্তু শম্ভুনাথবাবুর বেয়াড়া তাড়ায় তাঁহার কোন কথাই বলা হইল না। তিনি নীরবে কন্যাকে আনিবার জন্য অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শম্ভুনাথবাবু পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তামাক ইচ্ছা করেন কি?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভদ্র লোকটি মাথাটা নাড়িয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে না, আমি তামাক টামাক বড় একটা বিশেষ কিছু খাইনি। ও সব কুঅভ্যাস যত না হয় ততই মঙ্গল।"

শম্ভুনাথবাবু গুড়গুড়ির নলে সজোরে টানের উপর টান দিয়া তামাকটা ধরাইবার চেষ্টায় ছিলেন; গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "খুব ভালো, ও যাই নেশা কর তাতেই লোকসান। দেখনা কেন ধোঁয়া কতকগুলো গেল্‌বার জন্যে মাসে একরাস ক'রে পয়সা খরচ। অথচ কোন ফল নেই, না হয় দেহের পুষ্টি, না হয় আহারের কাজ। এমন পয়সা খরচ হবে জান্‌লে কি এ গুখুরী করি! এক যুগের অভ্যাস কাজেই ছাড়তে সাহস হয় না। শেষ কি পেট ফুলে মরে থাক্‌ব। মোট কথা হচ্ছে ও নেশা মাত্রই খারাপ।"

ঘটক তখন খেলো হুকোয় মন মাতাইয়া ছিল, মাথাটা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "তামাকও কি নেশা নাকি? এটাকে ঠিক নেশার জিনিষ বলা যায় না। মদ, গাজা, গুলি, চণ্ডু এই সবই হ'লো নেশা, নেশার জিনিষ হ'লে কি আর এমন ধারা হরদম খাওয়া তা চলে যায়। এতক্ষণ চিত হ'য়ে পড়ে থাক্‌তে হ'তো। হুজুর তামাকটাকে ঠিক কিন্তু নেশার জিনিষ বলা যায় না। তামাকের গুণ অনেক দাঁতেরগোড়া—"

মোহিমবাবু কন্যাকে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন,

গোপাল ঘটক মাথাটা ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "আহা মেয়ে নয়তো যেন জগদ্ধাত্রী প্রতীমে। এস মা এস।"

স্বর্ণ ধীরে ধীরে আসিয়া আগন্তুকগণের সম্মুখে অবনত মস্তকে বসিয়া মাথাটা নীচু করিয়া একটী ক্ষুদ্র নমস্কার করিল। শম্ভুনাথ-বাবু পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ মেয়ের দেখবার কিছু নেই মশাই। যেমন চেহারা, তেমনি রং; যেমন মুখশ্রী, তেমনি লক্ষ্মীশ্রী। আমাদের মেয়ে আমাদের বেশী বলা ভালো দেখায় না,—কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে হ'লে এটুকু বলতেই হয়, এমন বৌ হওয়া অনেক ভাগ্যির কথা। মুখটা একটু তোলতো মা, বাবু একবার ভালো করে দেখুন!"

স্বর্ণ ধীরে ধীরে মুখখানি তুলিল;—স্নেহ প্রাণপণ শক্তিতে আজ তাহাকে মাজিয়া ঘষিয়া সাজাইয়া দিয়াছে। তাহার ঢলঢলে মুখখানি আজ একটু মলিন হইলেও,—তাহাতে সৌন্দর্য্যের কোনই অভাব ছিল না। শম্ভুনাথবাবু কিছুক্ষণ সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিয়া পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মশাই, মেয়েতে অপছন্দের কিছু কি আছে,—কিছু যদি জিজ্ঞাসা করবার থাকে জিজ্ঞাসা করুণ। এ সব মেয়ে কি পড়তে পায়;—না এ রকম মেয়ে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়!"

ভদ্রলোকটি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না আমার জিজ্ঞাসা কর-বার কিছু নেই, মেয়ে আমার পছন্দই হয়েছে, তবে কথা কি হচ্ছে

জানেন শুধু রূপে তো আর পেট ভরবে না। আর রূপও কিছু ধুয়ে ধুয়ে খাবার জিনিষ নয়।"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ সেটা একটা কথা বটে,—কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে দেখতে গেলে রূপটাও একটু চাই বই কি। একটা কাল মেয়ে ঘরে আন্‌লে আপাতত কিছু টাকা পাওয়া যায় বটে কিন্তু যখন তার আবার একরাশ কালো কালো মেয়ে হবে তখনই বিপদ, দুনো কড়ি দিয়েও পার পাওয়া যায় না। সে যাক,—এখন কি হ'লে আপনার ভাইটিকে ছাড়তে পারেন?"

ভদ্রলোকটি গোপাল ঘটকের দিকে একবার চাহিল, ঘটক মাথাটা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "মেয়ে যখন পছন্দ হয়েছে তখন কি আর দেনা পাওনার জন্যে ঠেকে থাকে। শুধু যেটুকু নেয্য না হ'লে নয় সেইটুকু দিলেই চলবে। নগদ হাজার টাকা, পঞ্চাশ ভরি গিনি সোনা, আর সত্তর ভরি রূপো। আর জামায়ের ঘড়ীর চেন আংটী খাট বিছানা এতো আছেই।"

শম্ভুনাথবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গুড়গুড়ির নলে মৃদু মৃদু টান দিতেছিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "হুঁ,—পাত্রটির কতদূর পড়াশুনো হয়েছে?"

ভদ্রলোকটি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "এন্‌ট্রেনস্‌ অবধি পড়েছিল,—কিন্তু ব্যায়রাম সায়রাম হওয়ায় পাড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহ'লে তিনি আর

এখন পড়াশুনো বিশেষ কিছু করেন না। তা যেন হ'লো আপাতত কি করেন ?"

ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "চাক্‌রি কচ্ছে। ই, আই, আর এ, এই সবে ঢুকছে এরই মধ্যে পনোর টাকা মাইনে হয়েছে। কাজটা ভালো এর পর আরও উন্নতি হবে।"

শম্ভুনাথ বাবুর মুখখানা ক্রমেই গম্ভীর হইয়া উঠিতে ছিল, বলিলেন, "বটে,—তা যেখানে থাকেন সে বাড়ীখানা কি আপনাদের নিজেরই।"

গোপাল ঘটক তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "আজ্ঞে না এখানে একজনদের সঙ্গে মিলে মিশে একসঙ্গেই আছেন। দেশে মস্তবড় দালান,—বিষয় আসয়ও ঢের।"

মহিমবাবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটাও কথা কহেন নাই,—এতক্ষণে বেশ একটু কিন্তু স্বরে বলিলেন, "ছেলে মোটে পনোর টাকা মাইনে পায়—"

কালি ঘটক তাহাকে আর কথাটা শেষ করিতে দিল না, তাড়া তাড়ি বলিয়া উঠিল, "ও জন্যে কিন্তু হবেন না,—কিন্তু হবেন না। আফিস্ ভালো ঝড়ঝড় মাইনে বেড়ে উঠবে। বাজারটা কি বুঝুন না। আজকাল কি ছেলের গায়ে হাত দেবার যো আছে। বাড়ীতে গিয়ে পাঁচ সাত হাজার নিয়ে সবাই হন্নে হয়ে পড় ছে। শুভকাজে আর কিন্তু হবেন না, কথাটা একেবারে পাকাপাকি করে ফেলুন।

আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না। ছেলে যেখানে কাজ কচ্ছে,—সে আফিসটা যে ভালো!"

শম্ভুনাথবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, চোখটা চাইয়া বলিলেন, "ভালো বলে ভালো;—পনোর টাকা মাইনে পান তার থেকে আবার কি এক ফণ্ডে আড়াই টাকা কেটে নেয় না? তাহ'লে পাত্রের আয় হ'লো সাড়েবার টাকা,—থাকেন একজনের সঙ্গে মিলে মিশে। না পাত্র অতি সুপাত্রই বটে!"

শম্ভুনাথ বাবু গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইয়া সহসা সেই পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মশাই কি পল্‌টনে কাজ করেন?"

শম্ভুনাথবাবুর কথায় ভদ্রলোকটি একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল বেশ একটু বিস্মিত ভাবে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না,—আমি এক জুয়ের আফিসে কাজ করি।"

শম্ভুনাথবাবু গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনার সাহস তো জুয়ের আফিসের মতন নয়। আপনার পল্‌টনে কাজ করা উচিত। সাড়েবার টাকা মাইনে ভায়ের বিয়েতে যে, আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা চাইতে পারে তার সাহসকে বলিহারি দিই। মশাইয়ের কি চাঁদনীতে পূর্ব্বে দোকান টোকান ছিল?"

শম্ভুনাথবাবুর কথায় ভদ্রলোকটি যেন একট কিন্তু হইয়া পড়িয়া

ছিলেন, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?"

শম্ভুনাথবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,"নইলে কি আর ওই ভায়ের বিয়েতে অত টাকা হাঁকতে পারেন। দেখেন নি চাঁদনীর দোকান দারেরা বার আনার জিনিষটা একেবারে পাঁচ টাকা হেঁকে বস্‌লো। নে কত কমাবি কমা !"

পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি মহা গরম হইয়া উঠিলেন। তিনি বরের ভাই তাঁহার সহিত বিদ্রূপ। শম্ভুনাথবাবুর দিকে ফিরিয়া তিনি বেশ একটু কঠিনকণ্ঠে বলিলেন, "না মশাই এ চাঁদনীর দর নয়। এই সেদিন একজনেরা তিন হাজার টাকা বলে সাধাসাধি করে গেছে! আমিতো আর আপনাদের বাড়ীতে যেচে বিয়ে দিতে আসিনি খবর পাঠিয়েছিলেন তাই এসেছি। ওর এক পয়সা কমে আমি আমার ভায়ের বিয়ে দেব না।"

শম্ভুনাথবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "চটেন কেন, এতে চটবার কি আছে। যারা তিন হাজার টাকা দিতে চেয়ে ছিল সন্ধান নিয়ে দেখবেন তাদের মেয়ে বোধ হয় হাবা বোবা কিংবা মেয়ের বাপ একেবারে পাগল।"

কোন বরের ভ্রাতারই এ কথা সহ্য করা অসম্ভব। ভদ্র লোকটি একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—চোখ মুখ লাল করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মশাইতো খুব লেক্‌চার

দিচ্ছেন, আমাদের বাড়ীও ভবানীপুর আমাদের জান্‌তে কিছুতো বাকি নেই, নাম কল্লেতো হাড়ী ফেটে যায় আপনি কোন হিসেবে ছেলের বিয়েতে পঞ্চাশ হাজার হাঁক্‌ছেন! কই দেখি না কেমন বুকের পাটা, আপনাদেরও তো পালটা ঘর, দিন না আপনার ছেলের সঙ্গে এর মেয়ের বিয়ে।"

গুড়গুড়ির নলটা শম্ভুনাথবাবুর হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল,—তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর সমস্ত ঘরের ভিতর যেন একেবারে গমগম করিয়া উঠিল, "কামানের আওয়াজ সহ্য হয় কিন্তু এ মোশার ভন্‌ভনানি একেবারে অসহ্য। আমি যদি আমার ছেলের সঙ্গে এর মেয়ের বিয়ে না দিই তো আমার নাম শম্ভুনাথ ঘোষ নয়।"

গোপাল ঘটক হাতখানা নাড়িয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা দিব্যি দেশালায় দরকার কি আছে?"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শম্ভুনাথবাবু যখন বাটী ফিরিলেন,—তখন বেলা প্রায় দুপুর বাজে। প্রচণ্ড রৌদ্রে সমস্ত কলিকাতা নগরটা যেন তাতিয়া পুড়িয়া ছারকার হইবার মত হইয়া উঠিয়াছে। সরকার মহাশয় আহার শেষ করিয়া একটা পান চিবাইতে চিবাইতে সবে মাত্র এক কলিকা তাম্রকুট সেবনের ব্যবস্থা করিতে যাইতেছিল সেই সময় বাবুকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি হাতের হুঁকাটা এক পার্শ্বে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শম্ভুনাথবাবু গাড়ী হইতে নামিয়া ক্ষুদ্র কম্পাউণ্ডটি পার হইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার দরজায় পা দিতেই তাঁহার সহিত সরকার মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইল। তিনি একটা বক্র দৃষ্টিতে সরকার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "বলি এদিকেতো বেশ পানটান খেয়ে মুখটুক লাল করে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আছ! বলি কাজ কর্ম্ম করবার বুঝি আর ইচ্ছে নেই। যদি সেই মতলবই হয় ছেড়ে দাও না,—আমিতো দু'হাজার বার বলছি। তাহ'লে তুমিও পরিত্রাণ পাও আমিও পরিত্রাণ পাই।"

শম্ভুনাথবাবুর মুখ চখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া সরকার মহাশয়

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মাথাটা চুলকাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "এই সবে সেবা করে উঠলেম, তাই এক খিলি পান মুখে দিয়েছি। কাজেতো কিছু গাফি—"

শম্ভুনাথবাবু সরকার মহাশয়ের মুখের সম্মুখে হাত দুইটা নাড়িয়া বলিলেন, "থাম, থাম! প্রতি কথা ওই এক গাফিলি,—প্রতি কথায় কার এমন খেয়েদেয়ে কাজ নেই বাপু যে তোমায় গাফিলি বোঝায়? বলি কাল বাদে পরশু যে আমার ছেলের বিয়ে তার কি কচ্ছো বল! সে বিষয়ে তো বেশ নিশ্চিন্ত আছ!"

সরকর মহাশয় মাথাটা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে সে খবরতো আমরা জানতুম না। এখন কি কর্ত্তে হবে আজ্ঞা কল্লে—"

শম্ভুনাথবাবুর স্বরটা বেশ তীব্রভাবে বাহির হইয়া আসিল, "এ সব না জানলে কি আর চাকরী করা চলে। চাকরী কর্ত্তে গেলে এ সব জানতে হয়। এখন হ'লো কিনা আজ্ঞা কল্লে, আরে আজ্ঞে করেই বা কে, আর ওর ভেতর আজ্ঞের আছেই বা কি?"

শম্ভুনাথবাবু কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, আর সরকার মহাশয় একেবারে মহা সঙ্কোচিত ভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, শম্ভুনাথবাবু অন্তপুরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া ফিরিয়া বলিলেন, "এখন যাও একটু নিদ্রার ব্যবস্থা

করগে যাও, একপেট আহার হয়েছে এইবার একটু ঘণ্টা পাঁচ সাত নিদ্রার ব্যবস্থা হক্,—সঙ্গে সঙ্গে আমারও স্বর্গলাভ হক্। বলি বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত আমার পেছনে পেছনে আস্‌ছো কোথায়? এখন তো শুনেছ, এখন যাও যা হয় একটা ব্যবস্থাতো কর্ত্তে হবে।"

সরকার মহাশয় আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শম্ভুনাথবাবু আর দাঁড়াইলেন না। একেবারে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। শ্যামাসুন্দরী গৃহের মেঝের উপর বসিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় আজ আবার বহুদিন পরে ঢুলিতেছিলেন। নিদ্রার আমেজে তাঁহার চক্ষু পল্লব জড়াইয়া গিয়াছিল। স্বামীর পদশব্দে তিনি বেশ একটু চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু মেলিলেন। শম্ভুনাথবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া জামা কাপড় না ছাড়িয়াই একেবারে আসিয়া পালঙ্কের উপর আড় হইয়া পড়িলেন। শ্যামাসুন্দরী স্বামীর মুখ চোখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া মহা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন করে যে এসে শুয়ে পড়লে! অসুখ বিসুখ করেছে নাকি? যেখানে গেসলে সেখানে মেয়ে দেখা হ'য়ে গেল?"

শম্ভুনাথবাবু পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন, বলিলেন, "হুঁ, মেয়ে দেখাতো হ'লো, কিন্তু সব একেবারে গোলযোগ হ'য়ে গেল। হঠাৎ ঝাঁ করে একটু রাগ হয়ে যাওয়ায় একেবারে সব

ওলোটপালোট হয়ে গেল। কথায় বলে রাগের চেয়ে শত্রু নেই। কথাটা দেখ্‌ছি যথার্থই বটে।"

স্বামীর কথায় শ্যামাসুন্দরী বেশ একটু কিন্তু হইয়া পড়িলেন,—তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওইতো তোমার দোষ, যে কাজে হাত দেবে তাতেয় একটা গোলমাল না করে ছাড়্‌বে না। তারা নিজের দুঃখের জ্বালাই একে মরছে, তাঁদের সঙ্গে বুঝি আবার ঝগড়া ঝাটি করে এলে?"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "ঝগড়া ঝাটি নয়,—রাগের মাথায় ফস্ করে একটা শক্ত দিব্বি করে ফেলা একেবারেই উচিত হয়নি।"

শ্যামাসুন্দরী স্বামীর কথায় ক্রমেই মহা বিচলিত হইতেছিলেন, মহা উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "শুধু শুধু আবার শক্ত দিব্যি করতে গেলে কেন গো?" তোমার কি কিছু ভালো নয়। হঠাৎ দিব্যিটা হোল কেন?"

শম্ভুনাথবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "ও কেনর মীমাংসা নেই। ওই যে বললুম যেমন একটু রাগ হয়েছে অমনি সব গোলমাল হয়ে গেছে। সে যাক্ যখন কটূ দিব্যি করেই ফেলেছি তখন আর চারা নেই। পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান। শুধু কি তাই আবার ঘরের এক কাড়ী টাকা খরচ। তা ভেবে এখন আর কি কর্চ্ছি বলো, যখন কটূ দিব্যি করে ফেলেছি—তখন

মহিমবাবুর মেয়ের সঙ্গেই পচুর বিয়ে দিতেই হবে। রোধ হবার আর কোন উপায়ই দেখছিনি।"

শম্ভুনাথবাবুর মুখখানা একেবারে গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি গবাক্ষের দিকে মুখ ফিরাইলেন। স্বামীর কথায় শ্যামা-সুন্দরীর সমস্ত প্রাণটা যেন একটা নিবিড় আনন্দে উছলিয়া উঠিয়াছিল, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাই নাকি,—তা আহা বেশ হয়েছে। অমন মেয়ে কি সচরাচর পাওয়া যায়, আমি কালিঘাটে জোড়া পাঁটা মেনেছি। তাকি আর বৃথা হবার যো আছে?"

শম্ভুনাথবাবু মথাটা ঘুরাইয়া পত্নীর মুখের দিকে চোখ দুটো বেশ একটু বড় করিয়া চাহিয়া মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "এর ভেতর আবার জোড়া পাঁটা মানা হয়েছে। যাহ'ক একটা কিছু যে হয়েছে তা আমি তখনই বুঝেছিলুম,—তা নইলে অমন ফস্ করে রাগই বা হবে কেন, আর অমন কটূ দিবিাই বা করে বসবো কেন। মায়ের কাছে যখন পাঁটা মানা হ'য়েছে তখন তিনি কি আর জিহ্বা না বের করে ছাড়েন। সেখানে তো এতক্ষণ মেয়ের মা কোমর বেধেছেন, এখন ছেলের মা আর নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কেন, কোমর বাধুন। সময়ও কি আছে ছাই, মাঝে মোটে একটা :দিন। গেরো যখন ধরেছে তখন কি আর কিছু না নিয়ে রক্ষা আছে? আমি আর গেঁরো দিয়ে

কত রাখি, সবাই মিলে পেছনে লাগ্‌লে ভগবান্ ফতুর হ'য়ে যায়,—আমিতো সামান্য মানুষ। যাও,—যাও দাঁড়িয়ে কেন গায়ে হলুদের একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে হবেতো। এক ছেলে, লোকে যানে বড়লোক, একটু টেনেটুনে চল্‌তে গেলিই গায়ে যে সবাই থুথু দেবে।"

আনন্দময়ী আর দাঁড়াইলেন না এই আনন্দ সংবাদটা পুত্রকে দিবার জন্য তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।
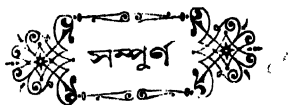
গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাবলি !

১।	পাষাণে প্রাণ	...	...	১৲
২।	রঙ্গ বারিধি	...	...	১৲
৩।	বিয়ের হাসি	...	...	।/০
৪।	একে আর	...	...	।৵০
৫।	কুল বধূ	...	...	১৲
৬।	সতীর স্বর্গ	...	...	১।০
৭।	মিলন	...	...	১৲
৮।	ঘরের লক্ষ্মী	...	...	১॥০
৯।	সঙ্গিনী	...	...	১৲
১০।	বিয়ের ক'নে	...	...	১॥০
১১।	বঙ্গ-বালা	...	...	১॥০
১২।	বিধির বিধি	...	...	১।০
১৩।	মানীর মান			১॥০
১৪।	কালের কোলে		...	১৲
১৫।	সমাজ বিপ্লব	...	...	॥০
১৬।	মাতৃ-হারা	...	...	১৲